আমার
বাংলা ভাষা

আমার
বাংলা ভাষা

সম্পাদনায়

ড. ইউসুফ খান

আমার বাংলা ভাষা
সম্পাদনায়: ড. ইউসুফ খান
প্রকাশকাল : অমর একুশে বইমেলা-২০২৩
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : ছায়ানীড়
প্রচ্ছদ: তারুণ্য তাওহীদ
বর্ণ বিন্যাস : লিজা তালুকদার
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য : ৩৫০/- (তিনশত পঞ্চাশ টাকা) মাত্র
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৭২৩৫-১-৬
ISBN: 978-984-97235-1-6

Amar Bangla Bhasha By Dr. Yousuf Khan, Published by Chayyanir.Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900. Date of Publication: Boimela-2023, Copy Right: Chayyanir; Cover design: Tarunnya Tauhid; Book Setup: Liza Talukder, Price: 350/- (Three Hundred Fifty) Taka Only; ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন−http://rokomari.com/ ; ফোনে অর্ডার : ০১৬১-১৯১৩২১৪

উ ৎ স র্গ

ভাষার অস্তিত্ব রক্ষায় যাঁরা সংকল্পবদ্ধ
ভাষার উৎকর্ষে যাঁরা প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন
তাঁদের তরে।

শুরুর কথা

আমার বাংলা ভাষা আমার গৌরবের, আমার অহংকারের। বাংলা আমার স্বপ্ন, বাংলা আমার ভালোবাসা। পৃথিবীতে সবচেয়ে মধুরতম ভাষা বাংলা। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আজ মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে, এর মূলে রয়েছে বাঙালির ভাষা আন্দোলন। হাজার বছর পূর্বে যে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল সেই চর্যাপদ থেকে আজকের বাংলা ভাষা ক্রমেই শিল্পময় হয়ে ওঠেছে। সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে ভাষার বানান রীতি ও উচ্চারণ রীতিতেও রূপান্তর ঘটেই চলছে। ভাষাবিদ, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক সকলেই বাংলা ভাষার গৌরব রক্ষায় নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলা ভাষা হবে একদিন বিশ্ববাসীর ভাষা। বিশ্বের প্রতিটি দেশে বাঙালির বসবাস অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বত্র বাংলা ধ্বনিত হয় নীরবে ও সরবে। পৃথিবীর বহুদেশে শহিদ মিনার নির্মিত হচ্ছে, গড়ে উঠছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু বাংলায় ভাষণ দিয়ে বিশ্বের ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। সেই ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত। রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলা ভাষার শুদ্ধ চর্চা আমাদের জীবনের ব্রত। যাপিত জীবনের সর্বত্র বাংলা ভাষা ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে বাংলা ভাষা বিস্তৃত হচ্ছে, বাংলা ভাষার উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বময়। আমি বাঙালি এ কথা বলার মাঝে আমার গৌরব আমার ভাষা বাংলা- এই সুদৃঢ় উচ্চারণে বাঙময় হয়ে ওঠে আমার জাতিসত্তা। ‘আমার বাংলা ভাষা’ গ্রন্থে আমার প্রবন্ধসহ প্রিয়ভাজন লেখকদের মূল্যবান সংকলন। এ সংকলন আজ ও আগামীর মূল্যবান দলিল। ভাষার প্রতি প্রেম থেকে, ভাষার প্রতি ভালোবাসা থেকে ‘আমার বাংলা ভাষা’ নবজন্ম লাভ করলো। নবজন্মের প্রতি সকলের সুদৃষ্টি প্রত্যাশায়

ড. ইউসুফ খান

সূচী

চেতনায় বাংলা ভাষা # ১১
ড. ইউসুফ খান

বাংলা ভাষার জন্মকথা # ১৫
হুমায়ুন আজাদ

বাংলা ভাষা আমাদের প্রাণের ভাষা # ১৮
যতীন সরকার

একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের প্রেরণার উৎস # ২২
তোফায়েল আহমেদ

মাতৃভাষার জন্য ভালোবাসা # ২৯
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন # ৩৫
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

অমর একুশ ও বাংলা ভাষা প্রয়োগের বাস্তবতা # ৪৩
ড. মিল্টন বিশ্বাস

বাংলা ভাষা এখন সারা বিশ্বের # ৫১
নজরুল ইসলাম

অমর একুশে ও মাতৃভাষা # ৫৬
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন

একুশের চেতনা ও ভাষাপ্রেম # ৬০
সালাম সালেহ উদদীন

একুশের সাহিত্য # ৬৪
মাহবুবুল হক

বাংলা ভাষার বাংলাদেশ # ৮৩
প্রফেসর ড. আবদুল খালেক

একুশের চেতনা ও বাংলা ভাষার বর্তমান বাস্তবতা # ৮৭
আহমদ রফিক

সত্যিই বিস্ময়কর # ৯৪
মো. লুৎফর রহমান

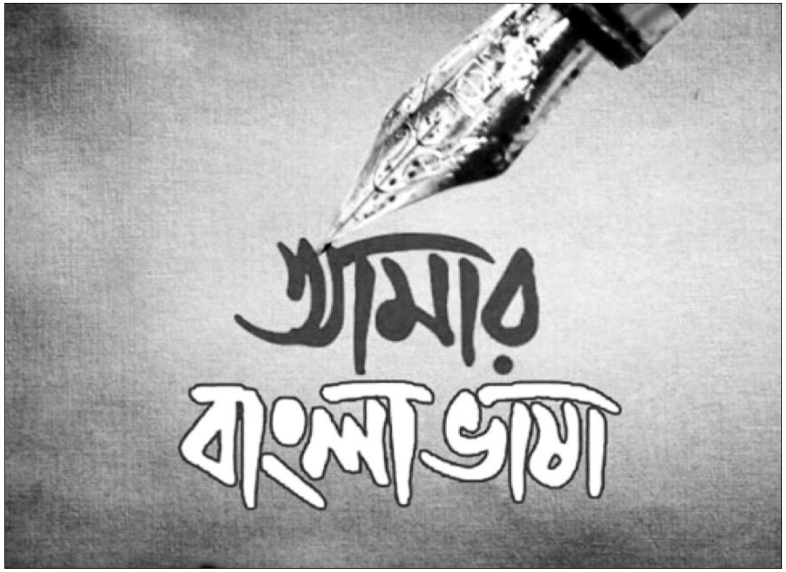

চেতনায় বাংলা ভাষা

ড. ইউসুফ খান

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ, পণ্ডিত ও দার্শনিক। মাতৃভাষার প্রতি ছিল তার গভীর ভালোবাসা। এই জ্ঞানতাপস মানুষটি মনে করতেন, "মাতা, মাতৃভূমি, মাতৃভাষা এ তিনের প্রতি যার শ্রদ্ধা নেই সে মানুষ নয়।" মা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে আমাদের জীবন, আমাদের অস্তিত্ব। আমাদের প্রত্যেকের মন-প্রাণ ও ব্যক্তি সত্তার পরতে পরতে মিশে আছে মা ও মাতৃভাষা। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আকুলতা-ব্যাকুলতা প্রকাশের ভাষা হলো আমাদের মাতৃভাষা। মাতৃভাষা কথাটির আক্ষরিক অর্থ হলো মায়ের ভাষা। কিন্তু ভাষা বিজ্ঞান অনুসারে মাতৃভাষার সংজ্ঞায় আক্ষরিক অর্থে মায়ের মুখের ভাষাকেই মাতৃভাষা বলে। জন্মের পর একজন মানুষ তার মায়ের কাছ থেকে প্রথম যে ভাষাটি

শেখে সেটাই ওই ব্যক্তির মাতৃভাষা। ভাষা হচ্ছে ভাবের বাহন। ভাষা আমাদের পরিচয়, আমাদের গৌরব, আমাদের সত্তা, আমাদের অহংকার, আমাদের প্রেরণা-চেতনা, আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। বাংলা ভাষার মাধ্যমেই আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি, মতবিনিময় করি। স্বপ্ন-বাসনা, স্নেহ-মমতা, আবেগ-অনুভূতি, সুখ-দুঃখ, হাসি-আনন্দ একে অন্যের সাথে আদান-প্রদান করি।

প্রাণিজগতেও সকলের নিজস্ব ভাষা আছে এবং সেই ভাষার মাধ্যমে তাদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ও ভাব বিনিময় হয়ে থাকে। তবে মানুষই একমাত্র জীব যারা ভাষার ক্ষেত্রে অনন্য উচ্চতায় আসীন হয়েছে। আবার বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতিভেদে মানুষের মুখের ভাষাও আলাদা। ভাষার এই বৈচিত্রের ফলে বিভিন্ন ভাষার জন্ম হয়েছে। ছোট থেকেই মা বাবা ও পরিবারের কাছ থেকে শেখা ভাষাই হয়ে উঠে তার মুখের ভাষা। তাইতো নিজের মাতৃভাষায় মনের অনুভূতিগুলো প্রকাশ করার মতো শান্তি অন্য কোনো ভাষায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের ভাষা আন্দোলনের মাস। অধিকার অর্জনের মাস। চেতনায় উদ্ভাসিত হওয়ার মাস। তাইতো ফেব্রুয়ারি মাস এলেই আমাদের মধ্যে নতুন করে ভাষাপ্রেম জেগে উঠে। একুশের মূল চেতনা ছিল রাষ্ট্রের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু রাখা। কিন্তু আমরা কি তা পেরেছি ? জাতীয়ভাবে চারটি দিবসকে কেন্দ্র করে চারটি মাস যথাক্রমে ভাষার মাস, বিজয়ের মাস, স্বাধীনতার মাস ও শোকের মাস হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং নানা কর্মসূচি পালিত হয়ে থাকে। ওই চার মাসের প্রতিটি মাস এলেই জাতীয় ও সামাজিকভাবে নানা আয়োজন-আনুষ্ঠানিকতা পালিত হয়। ওই সময়ে আমাদের গণমাধ্যমগুলোও সম্প্রচারে নেমে পড়ে। অর্থাৎ ভাষার মাস এলে দেশজুড়ে মাতৃভাষাকে নিয়ে হৈচৈ পড়ে যায়। সাংস্কৃতিক কর্মসূচি, বইমেলা, আলোচনা সভা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ পাঠ, অনিবার্য হয়ে উঠে। বাংলা ভাষায় বই প্রকাশের জন্য প্রকাশকরা এই মাসকে বেছে নেয়। মাতৃভাষার প্রতি এমন উচ্ছ্বাস ও সীমাহীন আবেগ অপরাপর জাতির ক্ষেত্রে তেমন একটা দেখা যায় না।

মাসজুড়ে মাতৃভাষা নিয়ে এতসব উৎসব আনুষ্ঠানিকতা পালিত হলেও মাতৃভাষার ব্যবহার কিন্তু আজও নিশ্চিত হয়নি। অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাস এলে বাংলা ভাষা নিয়ে যতটা আবেগ আর উচ্ছ্বাস দৃশ্যমান হয় এর সর্বজনীন ব্যবহার কিন্তু ততটা দৃশ্যমান হয় না। আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারার শিক্ষাক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় মাতৃভাষা যেন ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। ফলে

ঔপনিবেশিক ভাষার চর্চা দিন দিন বেগবান হচ্ছে। বিত্তবান ও মধ্যবিত্তরা ছুটছে ইংরেজি ভাষার অভিমুখে। অপরদিকে দরিদ্র শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য গড়ে উঠেছে অজস্র আরবি ভাষা ভিত্তিক মাদ্রাসা। ভাষার মাসের সাথে বাস্তবতার মিল তো নেই-ই বরং রয়েছে ভিন্ন চিত্র। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি, ফেব্রুয়ারি মাস এলেই ভাষার প্রতি আমাদের আবেগ আর ভালোবাসা বেড়ে যায় বটে, কিন্তু ফেব্রুয়ারি চলে গেলেই যেমন চলছিল, তেমনি চলতে থাকে।

কোনো ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশের অন্যতম উপায় হলো শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলা ও লেখা। বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষা এবং একই সঙ্গে দাপ্তরিক ভাষা। সব সরকারি ও কর্মপ্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষায় কার্যক্রম সম্পন্ন হলেও বাংলা ভাষার শুদ্ধতা কী আমরা রক্ষা করতে পারছি? বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা কী দায়দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছি ? ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কী শুধুই একটি মাস? কেন এই অবজ্ঞা? কেন এই অবহেলা? স্বাধীনতার ৫০ বছর পেরিয়ে গেলেও সর্বস্তরে মাতৃভাষা বাংলার সম্মানজনক প্রতিষ্ঠা করতে না পারাটা সত্যিই বেদনাদায়ক। আমরা ইংরেজি লেখার সময় কেন এতো সতর্ক থাকছি ? কারণ যোগ্যতা ক্ষুণ্ন হবে। কিন্তু বাংলা ভাষায় ভুল বানান লেখায় কারো যোগ্যতা বা দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে না। তাইতো শুদ্ধ বানানে শুদ্ধ উচ্চারণের চর্চার বিষয়ে কারো কোনো ভ্রুক্ষেপ নাই, সংশোধনের তাগিদ নাই। গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করে চলছি। সুতরাং তাদের ভাষা জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তোলাটা খুবই যৌক্তিক। কোনোকিছু লেখার আগে সন্দেহ দেখা দিলে অভিধান দেখে নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলাটাই ভালো বলে মনে করি। আসলে সমস্যা হচ্ছে আমাদের মানসিকতায়। শুদ্ধ বানানের চর্চায় ইচ্ছা ও আন্তরিকতটাই প্রধান। এ বিষয়ে আমাদের পর্যাপ্ত বই পুস্তক রয়েছে, সুযোগও রয়েছে। কিন্তু নেই ভাষার প্রতি ভালোবাসা। অভিজ্ঞমহল মনে করেন, কঠিন আইন ও জরিমানার মাধ্যমে এ স্বেচ্ছাচারিতার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।

কোনো জাতিকে ধ্বংস করে দিতে চাইলে প্রথমেই ধ্বংস করে দিতে হবে তার মুখের ভাষাকে। এ কথাটির সত্যতা অনুধাবন করতে পেরেই ইংরেজরা এ দেশে ইংরেজি ভাষা চালু করে। ফলে ২'শ বছর এ দেশবাসীকে শাসন শোষণের মাধ্যমে বাঙালিদের মাতৃভাষার গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ ভাগের পর পাকিস্তানিরাও ইংরেজদের পথ অনুসরণ করে। তারই প্রতিবাদে চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলন। তাইতো আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সময় বায়ান্ন থেকে একাত্তর। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনই হলো আমাদের স্বাধীনতার সিঁড়ি। একাত্তরে অর্জিত

হয়েছে স্বাধীনতা। দুটো আন্দোলনেই রক্ত ঝরেছে। রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে মাতৃভাষা ও স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা যদি আমরা না পেতাম তাহলে কি হতো ? বাংলা মটরের নাম থাকতো পাক মটর। ঢাকার সকল সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড লেখা হতো উর্দুতে। জাতীয় স্মৃতিসৌধ থাকতো না। বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার ক্রিকেটার হিসেবে সাকিব আল হাসানের এ প্রতিভা আবিষ্কৃত হতো না। আর তাছাড়া পাকিস্তানের জাতীয় দলে কোনো বাঙালিই কোনোদিন সুযোগ পেত না। ড. ইউনুসও নোবেল পুরষ্কার পেতো না। স্বাধীনতা ছাড়া গ্রামীণ ব্যাংকও হতো না, বিশ্বের সর্ববৃহত এনজিও ব্র্যাকও হতো না। স্বাধীনতা হলো পরশ পাথর যা বদলে দিয়েছে গোটা বাংলাদেশকে। বাংলাদেশ হতে চলেছে পৃথিবীর অন্যতম অর্থনীতির দেশ। বাংলাদেশ সবকিছুতেই ভালো করছে। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ফল উৎপাদনে রেকর্ডধারী। মাছ উৎপাদনে দুনিয়ার সেরাদের তালিকায়। গার্মেন্টস রপ্তানিতেও অন্যতম সেরা। দেশ স্বাধীন হয়েছে বলেই তো এ সকল সম্ভব হয়েছে। আর সেই স্বাধীনতার স্বপ্ন যিনি দেখিয়েছিলেন তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই আজকের এই গৌরবের দিনে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

লেখক: প্রাবন্ধিক, গবেষক ও অর্থনীতি বিশ্লেষক

বাংলা ভাষার জন্মকথা

হুমায়ুন আজাদ

কোথা থেকে এসেছে আমাদের বাংলা ভাষা ? ভাষা কি জন্ম নেয় মানুষের মতো ? বা যেমন বীজ থেকে গাছ জন্মে তেমনভাবে জন্ম নেয় ভাষা ? না, ভাষা মানুষ বা তরুর মতো জন্ম নেয় না। বাংলা ভাষাও মানুষ বা তরুর মতো জন্ম নেয়নি, কোনো কল্পিত স্বর্গ থেকেও আসেনি। এখন আমরা যে বাংলা ভাষা বলি এক হাজার বছর আগে তা ঠিক এমন ছিল না। এক হাজার বছর পরও ঠিক এমন থাকবে না। ভাষার ধর্মই বদলে যাওয়া। বাংলা ভাষার আগেও এদেশে ভাষা ছিল।

সে ভাষায় এদেশের মানুষ কথা বলত, গান গাইত, কবিতা বানাত। মানুষের মুখে মুখে বদলে যায় ভাষার ধ্বনি। রূপ বদলে যায় শব্দের, বদল ঘটে অর্থের। অনেকদিন কেটে গেলে মনে হয় ভাষাটি একটি নতুন ভাষা হয়ে উঠেছে। আর সে ভাষার বদল ঘটেই জন্ম হয়েছে বাংলা ভাষার।

আজ থেকে এক শ বছর আগেও কারও কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে। কেউ জানত না কত বয়স এ ভাষার। সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয় বাংলা ভাষায়। এক দল লোক মনে করতেন ওই সংস্কৃত ভাষাই বাংলার জননী। বাংলা সংস্কৃতের মেয়ে। তবে দুষ্টু মেয়ে, যে মায়ের কথামতো চলেনি। না চলে চলে অন্য রকম হয়ে গেছে। তবে উনিশ শতকেই আরেক দল লোক ছিলেন, যাঁরা মনে করতেন বাংলার সাথে সংস্কৃতের সম্পর্ক বেশ দূরের।

তাঁদের মতে, বাংলা ঠিক সংস্কৃতের কন্যা নয়। অর্থাৎ সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপত্তি ঘটেনি বাংলার। ঘটেছে অন্য কোনো ভাষা থেকে। সংস্কৃত ছিল সমাজের উঁচুশ্রেণির মানুষের লেখার ভাষা। তা কথ্য ছিল না। কথা বলত মানুষেরা নানা রকম ‘প্রাকৃত’ ভাষায়। প্রাকৃত ভাষা হচ্ছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কথ্য ভাষা। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, সংস্কৃত থেকে নয়, প্রাকৃত ভাষা থেকেই উদ্ভব ঘটেছে বাংলা ভাষার।

কিন্তু নানা রকম প্রাকৃত ছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে। তাহলে কোন প্রাকৃত থেকে উদ্ভব ঘটেছিল বাংলার ? এ সম্পর্কে প্রথম স্পষ্ট মত প্রকাশ করেন জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন। বহু প্রাকৃতের একটির নাম মাগধী প্রাকৃত। তাঁর মতে, মাগধী প্রাকৃতের কোনো পূর্বাঞ্চলীয় রূপ থেকে জন্ম নেয় বাংলা ভাষা। পরে বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং আমাদের চোখে স্পষ্ট ধরা দেয় বাংলা ভাষার ইতিহাস। যে ইতিহাস বলার জন্য আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে। পিছিয়ে যেতে হবে অন্তত কয়েক হাজার বছর।

ইউরোপ ও এশিয়ার বেশ কিছু ভাষার ধ্বনিতে, শব্দে লক্ষ্য করা যায় গভীর মিল। এ ভাষাগুলো যে সব অঞ্চলে ছিল ও এখন আছে, তার সবচেয়ে পশ্চিমে ইউরোপ আর সবচেয়ে পূর্বে ভারত ও বাংলাদেশ। ভাষাতাত্ত্বিকেরা এ ভাষাগুলোকে একটি ভাষাবংশের সদস্য বলে মনে করেন। ওই ভাষাবংশটির নাম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ বা ভারতী-ইউরোপীয় ভাষাবংশ। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশে আছে অনেক ভাষা-শাখা, যার একটি হচ্ছে ভারতীয় আর্যভাষা। ভারতীয় আর্যভাষার

প্রাচীন ভাষাগুলোকে বলা হয় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন রূপ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলোতে। এগুলো সম্ভবত লিখিত হয়েছিল যিশুখ্রিস্টের জন্মেরও এক হাজার বছর আগে, অর্থাৎ ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। বেদের শ্লোকগুলো পবিত্র বিবেচনা করে তার অনুসারীরা

সেগুলো মুখস্থ করে রাখত। শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে যেতে থাকে। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে যে ভাষা ব্যবহার করত বদলে যেতে থাকে সে ভাষা। এক সময় সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে বেদের ভাষা বা বৈদিক ভাষা। তখন ব্যাকরণবিদরা নানা নিয়ম বিধিবদ্ধ করে একটি মানসম্পন্ন ভাষা সৃষ্টি করেন। এই ভাষার নাম 'সংস্কৃত', অর্থাৎ বিধিবদ্ধ, পরিশীলিত, শুদ্ধ ভাষা। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দের আগেই এ ভাষা বিধিবদ্ধ হয়েছিল।

যিশুর জন্মের আগেই পাওয়া যায় ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি স্তর। প্রথম স্তরটির নাম বৈদিক বা বৈদিক সংস্কৃত। খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দ এ ভাষার কাল। তারপর পাওয়া যায় সংস্কৃত। খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দের দিকে এটি সম্ভবত বিধিবদ্ধ হতে থাকে এবং খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দের দিকে ব্যাকরণবিদ পাণিনির হাতেই এটি চূড়ান্তভাবে বিধিবদ্ধ হয়। বৈদিক ও সংস্কৃতকে বলা হয় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। প্রাকৃত ভাষাগুলোকে বলা হয় মধ্যভারতীয় আর্যভাষা। মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ অব্দ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ ভাষাগুলো কথ্য ও লিখিত ভাষারূপে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত থাকে। এ প্রাকৃত ভাষাগুলোর শেষ স্তরের নাম অপভ্রংশ অর্থাৎ যা খুব বিকৃত হয়ে গেছে। বিভিন্ন অপভ্রংশ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে নানান আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা- বাংলা, হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি, পাঞ্জাবি প্রভৃতি ভাষা।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, পূর্ব মাগধী অপভ্রংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে বাংলা; আর আসামি ও ওড়িয়া ভাষা। তাই বাংলার সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আসামি ও ওড়িয়ার। আর কয়েকটি ভাষার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা রয়েছে বাংলার সঙ্গে; কেননা সেগুলোও জন্মেছিল মাগধী অপভ্রংশের অন্য দুটি শাখা থেকে। ওই ভাষাগুলো হচ্ছে মৈথিলি, মগহি, ভোজপুরিয়া। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে অবশ্য একটু ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি একটি প্রাকৃতের নাম বলেন গৌড়ী প্রাকৃত। তিনি মনে করেন, গৌড়ী প্রাকৃতেরই পরিণত অবস্থা গৌড় অপভ্রংশ থেকে উৎপত্তি ঘটে বাংলা ভাষার।

লেখক: কবি, ঔপন্যাসিক, ভাষাবিজ্ঞানী, সমালোচক, রাজনীতিক ভাষ্যকার, কিশোর সাহিত্যিক, গবেষক, এবং অধ্যাপক

বাংলা ভাষা আমাদের প্রাণের ভাষা

যতীন সরকার

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতির জন্য একটি ঐতিহাসিক আন্দোলন। এ আন্দোলনের ইতিহাস আমাদের প্রাণের ইতিহাস। সে সময়ে এ আন্দোলন যেমন ঢাকাকেন্দ্রিক গড়ে উঠেছিল- ঠিক তেমনিভাবে গ্রামাঞ্চলেও এর একটি প্রভাব পড়েছিল। নেমেছিল আন্দোলনের ঢল। এখনো যদি আমাদের গ্রামে যাওয়া হয় এবং আজকের দিনে যারা বয়স্ক রয়েছেন- তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, তবে তারা এ বিষয়ে বলতে পারবেন বেশ ভালোভাবে। যেমনটি আমাদের মফস্বল শহর নেত্রকোনায়ও ঘটেছিল।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে আমি ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। তখন নেত্রকোনার চন্দ্রনাথ হাই স্কুলে পড়ি আমি। সম্ভবত মার্চের দিকে একদিন আমাদের ক্লাসে নাইন- টেনের

ছাত্ররা এসে জানায়, "আমাদের মাতৃভাষা বাংলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। পাকিস্তানের কথিত জাতির পিতা জিন্নাহ সাহেব ঢাকায় এসে বলেছেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দুই হতে চলেছে, সেখানে আমাদের সকলেই 'না' 'না' জানিয়ে দিয়েছেন। আমরা কিছুতেই সেটা মেনে নেব না। আমাদের যে মাতৃভাষা বাংলা, সেই মাতৃভাষাই রাষ্ট্রভাষা হতে হবে। পুলিশ অত্যাচার করেছে ছাত্রদের ওপর, আমরা এর প্রতিবাদে রাস্তায় বের হবো।"

তখন আমরা ছাত্ররা মিলে বেরিয়ে গিয়েছিলাম স্কুল থেকে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, জিন্নাহ সাহেবের বক্তব্য মানি না মানি না,' 'পুলিশের জুলুম বন্ধ কর'- এরকম আরও স্লোগান দিতে দিতে সারা শহর সেদিন প্রদক্ষিণ করেছিলাম। পরের দিন ভোরে নেত্রকোনা শহরের মুক্তাঙ্গণের মাঠে একটি সভায় মিলিত হই। সে সভায় তীব্র নিন্দা জানান বক্তারা। উর্দু রাষ্ট্রভাষা হবে তা আমরা কখনো ভাবিনি। ফলে আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললাম। মানুষকে সচেতন করতে শুরু করি। বাড়ি বাড়ি গিয়ে উঠান বৈঠকও করি।

তারপরের ঘটনা আমি গ্রামের স্কুলে চলে যাই। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ, আমি দশম শ্রেণির ছাত্র। আচমকা খবর পেলাম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাওয়ার জন্য- ঢাকায় ছাত্রদের ওপর গুলি চালানো হয়েছে। কিছু ছাত্রকে হত্যা করা হয়েছে। সেই সময়ে রেডিও ছিল না, টেলিভিশনও ছিল না গ্রামে। এজন্যই খবরটার বিস্তারিতভাবে জানা হয়নি তখন। কেবলমাত্র তমদ্দুন মজলিশের 'সৈনিক' পত্রিকা ছিল। ফলে এ পত্রিকার মাধ্যমেই খবর পেতাম। এরপর ৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি খবর পাই এ হত্যাকাণ্ডের, তারপর বেরিয়ে পড়ি রাস্তায়। পাশের বাজার ছিল বসুর বাজার, সেদিন হাটবারও ছিল। আমরা হাটে পৌঁছে হাটুরেদের বলি- 'আমাদের ভাষার ওপর পাকিস্তান সরকার উর্দুকে চাপিয়ে দিচ্ছে। এ প্রতিবাদে আমাদের ছাত্র ভাইদের ওপর ওরা বর্বরভাবে গুলি চালিয়েছে, হত্যা করা হয়েছে তাদেরকে। আমরা এর প্রতিবাদ করব, মানব না আমার ভাষার বঞ্চনা।' আমাদের বক্তব্যের আবেগে হাটের অনেক মানুষ কেঁদেছিল সেদিন।

তারপর আমরা বললাম, আজকে এর প্রতিবাদে গ্রামের এই বাজারে আমরা হরতাল পালন করব। গ্রামের মানুষজন হরতাল কী তা হয়তো চোখে দেখেনি- জানতো না; কিন্তু শব্দটা তাদের পরিচিত ছিল। ফলে আমাদের কথামতো তারাও একবাক্যে মেনে নিয়ে সব দোকান-পাট বন্ধ করে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। এভাবেই গ্রামের সাধারণ মানুষ ভাষার প্রতি সম্মান জানিয়েছিল।

ভাষা আন্দোলন ছিল মূলত সাংস্কৃতিকভাবে একটি বড় আন্দোলন। কোনো জাতিকে ধ্বংস করার জন্য তার ভাষার ওপরে আঘাত করলেই পুরোটা শেষ হয়ে যায়। একটা জাতির নিজের ভাষার ওপরে যখন চাপিয়ে দেওয়া হয় অনৈতিক বোঝা, তখন সে মরে যায়। মরে যায় তার কৃষ্টি। ভাষা মরে গেলে সে জাতি কখনো দাঁড়াতে পারে না। আর ভাষা না দাঁড়াতে পারলে তো এমনিই পঙ্গু হয়ে যায় যে কোনো জাতি। বাংলার স্বর, সুরে যে গায়ক গান করেছেন, গান লিখেছেন তারা বাঙালির প্রাণ। লালন, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল এঁরা আজ বিশ্বব্যাপী পরিচিত। পাকিস্তান সরকার '৫২ খ্রিস্টাব্দে এই বাংলা ভাষার ওপর আঘাত হানতে চেয়েছিল। ভেঙে দিতে চেয়েছিল আমাদের মর্যাদাময় সঙ্গীত, কবিতা আর সর্বোপরি প্রাণের ভাষাকে। আমরা দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেতাম যদি সেদিন এ আন্দোলন না হতো। আমরা তা হতে দিইনি। আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে আমরা রক্ষার চেষ্টা করেছিলাম বলেই পরবর্তীকালে আমাদের মানসিক শক্তি অটুট রয়েছে; আমরা পিছিয়ে পড়িনি বিশ্বের অন্যান্য অগ্রসর জাতি থেকে।

কিন্তু আজও ষড়যন্ত্রকারী প্রতিক্রিয়াশীল বিভিন্ন গোষ্ঠী যেন সক্রিয় হয়ে রয়েছে এদেশে। তারা আজও বাংলা বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। আর এক শ্রেণির অসচেতন মানুষেরা তাদের সন্তানদের ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে পাঠিয়ে তৃপ্তি পায়। তারা ভাবে না যে, ভাষার জন্য সারাবাংলা একদা কেঁপেছিল- প্রাণ দিয়েছিল আমাদের ভাইয়েরা, গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মতো খেটে মানুষেরাও পিছিয়ে ছিল না সেই আন্দোলনে, তারাও এ আন্দোলনে সাহায্য করেছিল। একাত্ম হয়েছিল আমাদের মিছিলে। তাদের বিবেকের কাছে এ প্রশ্ন ইংরেজি ভাষায় শিক্ষায় কতটুকু উন্নত হবে আপনার সন্তানের জীবন? যে নিজের ভাষা জানে না সে কী করবে? যার নিজের সংস্কৃতি জানা থাকবে না সে কতটা আপনাকে ভালোবাসবে? যে মানুষ তার ভাষার কীর্তিমানদের না জানে সে নিজেকে গড়বে কী করে? আমি মোটেই অন্য ভাষার বিরুদ্ধে না। তবে নিজের ভাষাকে তো সম্মান করতে হবে, জানতে হবে সংস্কৃতির পুরোটাই।

এজন্য বলি, ইংরেজি ভাষা আগে নয়, আগে আমার মায়ের ভাষা শিখতে হবে। আজকের মিডিয়াগুলোর দিকে তাকান যদি, তারা বাংলা-ইংরেজি গুলিয়ে কথা বলে। উপস্থাপনার নামে এগুলো ঠিক কী হয় তা বুঝে নিতে কষ্ট হয়। ভাষার চর্চা সঠিকভাবে হচ্ছে না সর্বস্তরে। যে জন্য আমরা পিছিয়ে পড়তে পারি সামনের দিনে। বিদেশি ভাষার কবলেও পড়তে পারি। বিশ্বের দরবারে বাংলাভাষা আন্দোলনের যে একটি সুন্দর ঐতিহাসিক দিক রয়েছে তা দেখা যাবে ম্লান হচ্ছে। এ কারণে বলি, আমাদের ভাষার চর্চা করতে হবে,

স্কুল-কলেজ, অফিস আদালত সবখানে। তা না হলে আমরা যে আশা নিয়ে ভাষার জন্য আন্দোলন করেছিলাম, সেই আদর্শ থেকে সরে যাবে আগামীর তরুণেরা।

এ বছর একই সঙ্গে আমরা বিজয়ের পঞ্চাশ বছর উদযাপন করছি। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় ছিনিয়ে আনা, যার ফল আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ, আলাদা মানচিত্র, আলাদা সংবিধান- এর প্রথম প্রেরণা বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন। এই সবই সম্ভব হয়েছে কেবল ভাষার জন্য। এ ভাষা আমাদের প্রাণের ভাষা, এ ভাষা ভুলি কী করে?

ভাষার মাসে মনে পড়ে আজ এতটা বছর পরে এসে- বাংলা ভাষার ওপর আঘাত হানার প্রতিবাদের মিছিল, সেই আন্দোলনের সময় যারা শহিদ হয়েছিলেন, যারা লড়াই করেছিলেন- তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। বিশ্বের দরবারে তারাই আমাদের ভাষার মর্যাদা তৈরি করে দিয়েছেন। তাঁদের স্মরণ করি শ্রদ্ধা ভরে।

লেখক: প্রগতিশীল চিন্তক ও লেখক

একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের প্রেরণার উৎস

তোফায়েল আহমেদ

ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে '৭১-এর একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শহিদ মিনারের পবিত্র বেদিতে পুষ্পমাল্য অর্পণের পর (আমার হাতে ছিল হ্যান্ডমাইক) বলেছিলেন, 'শহিদের রক্ত বৃথা যেতে দিব না। চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকারের জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। জননী জন্মভূমির বীর শহিদদের স্মরণে শপথ নিয়ে বলছি যে, রক্ত দিয়ে হলেও বাংলার স্বাধিকার আদায় করবো।'...

স্বাধীন বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ প্রতি বছর অমর একুশের শহিদ দিবসে মহান ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামীদের শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করে। ১৯৫২-এর ভাষা শহিদদের পবিত্র রক্তস্রোতের সঙ্গে মিশে আছে বাঙালির জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের গৌরবগাঁথা। '৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাংলার ছাত্রসমাজ আত্মদান করে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। রক্তরাঙা অমর একুশে ফেব্রুয়ারি রক্তের প্লাবনের মধ্য দিয়ে আজ সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গৌরবময় আসনে আসীন।

শুধু বাঙালি নয়, বিশ্বের প্রতিটি জাতির মাতৃভাষার মর্যাদা, স্বাধিকার, স্বাধীনতা ও মানুষের মতো বাঁচার দাবির সংগ্রামের দুর্জয় অনুপ্রেরণা সৃষ্টির চির অনির্বাণ শিখার দীপ্তিতে দিগন্ত উদ্ভাসিত করেছে একুশে ফেব্রুয়ারি। একুশে ফেব্রুয়ারি এদেশের মানুষকে শিখিয়েছে আত্মত্যাগের মন্ত্র, বাঙালিকে করেছে মহীয়ান। জাতি হিসেবে আমরা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সমন্বয়ে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ধারণ করেছি। মহান ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়ে এসেছে মহত্তর স্বাধীনতার চেতনা।

প্রকৃতপক্ষে মাতৃভাষার অধিকার রক্ষায় ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৪৮-এর ১১ মার্চ। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন-

"আমরা দেখলাম, বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে বাংলাকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এবং তমদ্দুন মজলিশ এর প্রতিবাদ করল এবং দাবি করল, বাংলা ও উর্দু দুই ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। আমরা সভা করে প্রতিবাদ শুরু করলাম। এই সময় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এবং তমদ্দুন মজলিশ যুক্তভাবে সর্বদলীয় সভা আহ্বান করে একটা 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করল। সভায় ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ই মার্চকে 'বাংলা ভাষা দাবি' দিবস ঘোষণা করা হল। জেলায় জেলায় আমরা বের হয়ে পড়লাম।" (পৃষ্ঠা-৯১, ৯২)।

'৪৮-এর ১১ মার্চ অন্যতম রাষ্ট্রভাষার দাবিতে বাংলার ছাত্রসমাজ প্রথম প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে। সেদিন যারা মাতৃভাষার দাবিতে রাজপথে সংগ্রাম করে কারাবরণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং জনাব শামসুল হক ছিলেন তাদের অন্যতম। মার্চের ১১ থেকে ১৫ এই পাঁচদিন কারারুদ্ধ ছিলেন নেতৃবৃন্দ। পাঁচদিনের কারাজীবনের স্মৃতিচারণ করে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন-

"দেওয়ালের বাইরেই মুসলিম গার্লস স্কুল। যে পাঁচ দিন আমরা জেলে ছিলাম সকাল দশটায় মেয়েরা স্কুলের ছাদে উঠে স্লোগান দিতে শুরু করত, আর চারটায় শেষ করত। ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা একটু ক্লান্তও হত না। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই,' 'বন্দি ভাইদের মুক্তি চাই,' 'পুলিশি জুলুম চলবে না'-নানা ধরনের স্লোগান। এই সময় শামসুল হক সাহেবকে আমি বললাম, হক সাহেব ঐ দেখুন, আমাদের বোনেরা বেরিয়ে এসেছে। আর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করে

পারবে না। হক সাহেব আমাকে বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ মুজিব'।" (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা-৯৩, ৯৪)।

বাংলার মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর অবিশ্বাস্য আত্মপ্রত্যয় ছিল! তখন কে জানত যে, '৪৮-এর এই ১১ মার্চের পথ ধরেই '৫২, '৬৯ এবং '৭১-এর একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনায় স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটবে! কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জানতেন! কারণ তিনি দূরদর্শী নেতা ছিলেন, লক্ষ্য স্থির করে কর্মসূচি নির্ধারণ করতেন। যেদিন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়, সেদিনই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এই পাকিস্তান বাঙালিদের জন্য হয়নি; একদিন বাংলার ভাগ্যনিয়ন্তা বাঙালিদেরই হতে হবে। আর তাই ধাপে ধাপে সমগ্র জাতিকে প্রস্তুত করেছেন চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য।

'৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারি। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংলগ্ন আমতলায় ছাত্রসভা। নুরুল আমীন সরকার আরোপিত ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রস্তুতি। ছাত্রসভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১০ জন মিছিল করে ১৪৪ ধারা ভাঙবে। ছাত্রসমাজ প্রতিবাদ মিছিল করে ১৪৪ ধারা ভাঙল। সরকারের পেটোয়া পুলিশ বাহিনী গুলি ছুড়লে সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, জব্বারসহ অনেকে শহিদ হন। আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়। বঙ্গবন্ধু তখন কারারুদ্ধ। কারাগারেই তিনি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে একাত্মতা প্রকাশ করে অনশন করেন। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে তিনি আরও লিখেছেন-

"মাতৃভাষার অপমান কোনো জাতি সহ্য করতে পারে না। পাকিস্তানের জনগণের শতকরা ছাপ্পান্ন জন বাংলা ভাষাভাষী হয়েও শুধু বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা বাঙালিরা করতে চায় নাই। তারা চেয়েছে বাংলার সঙ্গে উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষা করা হোক, তাতে আপত্তি নাই। কিন্তু বাঙালির এই উদারতাটাই অনেকে দুর্বলতা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে।" (পৃষ্ঠা-১৯৮)।

'৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন দেশের গ্রাম-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছিল। গ্রামে গ্রামে মিছিল হতো। সেই মিছিলে স্কুলের ছাত্রদের ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল। আমি তখন তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। মনে আছে তখনকার স্লোগান, 'শহিদ স্মৃতি অমর হউক,' 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই,' 'আমার ভাষা তোমার ভাষা, বাংলা ভাষা বাংলা ভাষা'।

'৬৯-এর একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। '৬৯-এর গণ-আন্দোলনের সর্বব্যাপী গণবিস্ফোরণ ঘটে একুশে ফেব্রুয়ারিতে। সেদিনও খুলনায় পুলিশের গুলিতে ১০ জন নিহত ও ৩০ জন

আহত হয়। '৬৯-এর ১৭ জানুয়ারি ১১ দফার দাবিতে যে আন্দোলন আমরা শুরু করেছিলাম একুশে ফেব্রুয়ারি তা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। ১৫ ফেব্রুয়ারি সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি ড. শামসুজ্জোহার মৃত্যুতে বাংলার মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিক্ষুব্ধ মানুষকে দমাতে সরকার সান্ধ্য আইন জারি করে। আমরা সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে রাজপথে মিছিল করি। '৫২-এর ভাষা আন্দোলনের চেতনা '৬৯-এর গণ-আন্দোলনের বাঁধভাঙা জোয়ারে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

আমাদের আহ্বানে বিগত ১৭ বছরের সমস্ত দৃষ্টান্ত ভঙ্গ করে ঢাকা নগরের অধিবাসীরা অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্যের মাধ্যমে মহান ভাষা আন্দোলনের অমর শহিদদের পবিত্র স্মৃতির প্রতি প্রাণঢালা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং প্রশাসনের সর্বত্র বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার জোর দাবি উত্থাপন করে। একটি সুন্দর-নিষ্কলুষ, নির্যাতন-নিপীড়নহীন, শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে ১১ দফার ভিত্তিতে সমগ্র জাতিকে এক মোহনায় শামিল করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

সেদিনের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলার ঘরে ঘরে স্বাধিকার ও স্বাধীনতার এক নতুন বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল। দিনটি ছিল শুক্রবার। একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদদের স্মরণে প্রথম সরকারি ছুটি আদায় করেছিলাম। কালো পতাকা উত্তোলন, আজিমপুর কবরস্থানে শহিদদের সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, প্রভাতফেরি, শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণের মধ্য দিয়ে আমাদের কর্মসূচি শুরু হয়। শহিদ দিবস উপলক্ষে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে শহিদ মিনারের পাদদেশে শপথ অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। '৬৯-এর একুশে ফেব্রুয়ারিকে মহান ভাষা আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য ধারা হিসেবে চিহ্নিত করে কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ বলেন-

"একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের সংগ্রাম আজ একনায়কত্ববাদী শাসন ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটিয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সাথে মিশে গেছে। ছাত্র-জনতা, শ্রমিক কৃষকের জনপ্রিয় ১১ দফার সংগ্রাম আজ তাই মহান ভাষা আন্দোলনের ঐতিহ্য অনুসরণ করছে। '৫২ খ্রিস্টাব্দের একুশে ফেব্রুয়ারির সংগ্রাম কেবল বাংলা ভাষার সংগ্রাম ছিল না। এ সংগ্রাম ছিল সারা দেশে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ও বাংলাভাষীদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দিবস।"

শহিদ আসাদ, মতিউর, মকবুল, রুস্তম, আলমগীর, আনোয়ারা, সার্জেন্ট জহুরুল হক, ড. শামসুজ্জোহাসহ ১১ দফা আন্দোলনের ৩৯ বীর শহিদ '৫২-

এর ভাষা আন্দোলনের শহিদ সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, জব্বারের সার্থক উত্তরসূরি। বিকাল ৩টায় পল্টন ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভা তো নয়, যেন জনসমুদ্র। জনসমাবেশের তুলনায় সেদিনের পল্টন ময়দানের আয়তন কম মনে হয়েছে। চতুর্দিক থেকে মানুষের ঢল নেমেছিল।

ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ সমাবেশ থেকে সরকারের উদ্দেশ্যে চরমপত্র ঘোষণা করে সমস্বরে বলেছিলেন- "আগামী ৩রা মার্চের পূর্বে দেশবাসীর সার্বিক অধিকার কায়েম, আইয়ুব সরকারের পদত্যাগ, রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব মামলা প্রত্যাহার, ১১ দফা দাবির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের প্রিয় নেতা শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি, সংবাদপত্র ও বাক-স্বাধীনতার উপর হতে সর্বপ্রকার বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করতে হবে।"

পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের জনসভায় সভাপতির ভাষণে যা বলেছিলাম দৈনিক ইত্তেফাকের পাতা থেকে পাঠকদের জন্য তা হুবহু তুলে দিচ্ছি-

"একুশে ফেব্রুয়ারি এই দিনটি আত্মপ্রত্যয়ের দিন, আত্মপরিচয় দেওয়া ও নেওয়ার দিন। ১৭ বৎসর পূর্বে এই দিনটি ছিল শুধু মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামের দিন। আজ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে এই দিনটি জনগণের সার্বিক মুক্তি সংগ্রামের দিন হয়ে দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বাংলা ভাষা, রবীন্দ্র সঙ্গীত ইত্যাদি নিয়ে স্বার্থান্বেষী মহল হতে নূতনতর যেসব বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে সেসব বিতর্ক ও এদের উত্থাপকদের সতর্ক করে বলছি, বাংলাদেশে জন্মজন্মান্তর বাস করেও যারা বাংলা ভাষায় কথা বলতে শিখে নাই, তাদের স্বরূপ আজ উদঘাটিত। এই শ্রেণির লোকেরা বেঈমান।

বাংলায় বেঈমানের কোনো স্থান হবে না এবং স্বাধিকারের সর্বাত্মক সংগ্রাম নিয়ে যদি তারা চিরন্তন পদ্ধতিতে রাজনৈতিক ঘুঁটি চালানোর প্রয়াস পান তবে আত্মরক্ষার পুরাতন প্রথা পরিত্যাগ করে প্রতি আক্রমণের পথে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব মামলার অন্যতম বন্দী শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হকের মর্মান্তিক মৃত্যুতে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলছি, এই মামলায় বন্দী আর কারো গায়ে যদি একটি আঁচড়ও লাগে তবে দেশব্যাপী দাবানল জ্বলে উঠবে। আর নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলছি, শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তাকে কেউ যেন নিজেদের রাজনৈতিক হাতিয়ার না করেন।"

স্বৈরশাসকের প্রতি চরমপত্র ঘোষণার পর সন্ধ্যায় দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে আইয়ুব খান নতিস্বীকার করে ঘোষণা করেন, তিনি আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না এবং এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয়। ২২ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ সব রাজবন্দিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় এবং ২৩ তারিখ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে ১০ লাখ মানুষের উপস্থিতিতে কৃতজ্ঞচিত্তে প্রিয় নেতাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

এরপর '৫২ ও '৬৯-এর রক্তস্রোতের পথ বেয়ে আসে '৭১-এর একুশে ফেব্রুয়ারি। '৭০-এর ঐতিহাসিক নির্বাচনে আমরা বিজয়ী হয়েছি। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে জেনারেল ইয়াহিয়া খান তখন নানামুখী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সে-সব ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে '৭১-এর একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শহিদ মিনারের পবিত্র বেদিতে পুষ্পমাল্য অর্পণের পর (আমার হাতে ছিল হ্যান্ডমাইক) বলেছিলেন, 'শহিদের রক্ত বৃথা যেতে দিব না।

চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকারের জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। জননী জন্মভূমির বীর শহিদদের স্মরণে শপথ নিয়ে বলছি যে, রক্ত দিয়ে হলেও বাংলার স্বাধিকার আদায় করবো। যে ষড়যন্ত্রকারী দুশমনের দল ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ হতে শুরু করে বারবার বাংলার ছাত্র-যুবক-কৃষক-শ্রমিককে হত্যা করেছে। যারা ২৩ বছর ধরে বাঙালির রক্ত-মাংস শুষে খেয়েছে, বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন বানচালের জন্য, বাঙালিদের চিরতরে গোলাম করে রাখার জন্য তারা আজও ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। শহিদের আত্মা আজ বাংলার ঘরে ঘরে ফরিয়াদ করে ফিরছে, বলছে, বাঙালি তুমি কাপুরুষ হইও না। স্বাধিকার আদায় করো। আমিও আজ এই শহিদ বেদী হতে বাংলার জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছি, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, প্রস্তুত হও, দরকার হয় রক্ত দিবো। কিন্তু স্বাধিকারের দাবির প্রশ্নে কোনো আপোষ নাই।"

অমর একুশে পালনে শহিদ মিনারে ব্যক্ত করা জাতির পিতার এই অঙ্গীকার আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে প্রিয় মাতৃভূমিকে স্বাধীন করেছি।

একুশে ফেব্রুয়ারি যুগে যুগে আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। বিশেষ করে '৫২, '৬৯ এবং '৭১-এর একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে অনন্য উচ্চতায় আসীন। একুশের চেতনার পতাকা হাতে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সুন্দরভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে একের পর এক লক্ষ্যপূরণ করছে। সফলভাবে করোনা পরিস্থিতি

মোকাবিলা ও কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন প্রদানেও বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সমগ্র বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জনহিতকর এসব সাফল্য বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। মহান একুশের চেতনায় জাগ্রত বাংলার মানুষ অতীতের মতো ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের আর্থসামাজিক বিকাশ বেগবান রাখবে- এই হোক এবারের একুশের অঙ্গীকার।

লেখক: আওয়ামী লীগ নেতা; সংসদ সদস্য; প্রাবন্ধিক।

মাতৃভাষার জন্য ভালোবাসা

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

১.

এই লেখাটি যেদিন প্রকাশিত হবে সেদিনের তারিখটি হবে ২১ ফেব্রুয়ারি। বাইরের দেশের যেসব মানুষ কখনও আমাদের ২১ ফেব্রুয়ারি দেখেননি তারা যখন প্রথমবার এদেশে এসে এই দিনটি দেখেন, নিঃসন্দেহে অনেক অবাক হয়ে যান। আমরা আবেগপ্রবণ জাতি হিসেবে 'বিখ্যাত' এবং ২১শে ফেব্রুয়ারিতে আমরা যথেষ্ট তীব্রতা দিয়ে সেই আবেগ প্রকাশ করি। মনে আছে, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম তখন ফেব্রুয়ারির ২০ তারিখে কার্জন হলের মালিকে খুবই মলিন মুখে ক্যাম্পাসে হাঁটাহাঁটি করতে দেখতাম। কারণ, সে বেচারা জানতো এত যত্ন করে গড়ে তোলা তার বাগানের অসংখ্য ফুল এক রাতের মধ্যে উধাও হয়ে শহিদ মিনারের বেদিতে স্থান নেবে। ২১

ফেব্রুয়ারি ভোরে আমরা তখন খালি পায়ে প্রভাতফেরিতে বের হতাম। শুধু যে শহিদ মিনারের বেদিতে আমরা জুতো পায়ে উঠতাম না তা নয়, পুরো প্রভাতফেরিতে আমাদের পায়ে জুতো থাকতো না। শুধু তা-ই নয়, পুরো ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে আলকাতরা নিয়ে ছাত্ররা বের হতো ইংরেজি কিংবা উর্দুতে লেখা সাইনবোর্ডের লেখা ঢেকে দেওয়ার জন্য। ফেব্রুয়ারি মাসে সব সংগঠন তাদের নিজের মতো করে শহিদ সংকলন বের করতো, সবাই তখন কবি, সবাই শিল্পী! আমি আমার জীবনে যত ২১ ফেব্রুয়ারি দেখেছি তার মাঝে সবচেয়ে তীব্রটি ছিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের। তখনও বঙ্গবন্ধুর ডাক দেওয়া অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়নি, ৭ মার্চের ভাষণ দিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণাও দেওয়া হয়নি, কিন্তু আকাশে বাতাসে তখন কীভাবে যেন আসন্ন স্বাধীনতার ঘোষণার বার্তাটি রটে গিয়েছিল। সেই দিনটিতে শহিদ মিনারে যেভাবে মানুষের ঢল নেমেছিল তার তুলনা পাওয়া কঠিন। সেই মানুষের ঢল দেখেই সম্ভবত পাকিস্তান মিলিটারি ২৫ মার্চের গণহত্যার পরিকল্পনা পাকা করে ফেলেছিল। সে কারণেই সম্ভবত গণহত্যার অংশ হিসেবে তারা সবার আগে শহিদ মিনারটি গুঁড়ো করে ফেলেছিল। ইটপাথরের শহিদ মিনারটি গুঁড়ো করে ফেললেই যে এ দেশের মানুষের বুকের ভেতর বাঁচিয়ে রাখা আসল শহিদ মিনার ধ্বংস করা যায় না, মাথা মোটা পাকিস্তানি মিলিটারিরা সেটা তখনও জানতো না।

২.

কেউ যদি ২১ ফেব্রুয়ারির তারিখটি বাংলা ক্যালেন্ডারে দেখেন তাহলে দেখবেন সেটা হচ্ছে ৮ ফাল্গুন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারিটিও ছিল ৮ ফাল্গুন। যেহেতু ২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের ভাষা আন্দোলনের শহিদ দিবস, একসময়ে অনেকে মনে করতেন দিবসটি ইংরেজি ২১ ফেব্রুয়ারি হিসেবে পালন না করে বাংলা ৮ ফাল্গুন হিসেবে পালন করা উচিত। তবে ২১ ফেব্রুয়ারি সারা পৃথিবীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করা শুরু হয়ে যাওয়ার পর আজকাল আর কাউকে সেই দাবিটি করতে দেখি না।

কেউ যেন মনে না করেন আমাদের ২১ ফেব্রুয়ারির বাংলা মাসের তারিখটি ঘটনাক্রমে এই বছর ৮ ফাল্গুন হয়ে গেছে। আসলে বাংলাদেশে বাংলা ক্যালেন্ডারে মাসগুলোকে এমনভাবে নেওয়া হয়েছে যেন আমাদের ঐতিহাসিক দিনগুলো প্রতিবছরই আসল বাংলা তারিখের সঙ্গে মিলে যায়। আমরা যারা শহুরে জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি তারা বিশেষ দিন না হলে ক্যালেন্ডারে বাংলা তারিখ নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাই না। তবে আমার নিজের জন্য বাংলা মাসের একটা অন্য ধরনের গুরুত্ব আছে। আমি ইংরেজি মাসের নাম শুনে

মাসটি কেমন আন্দাজ করতে পারি না। জুন মাস শুধুই জুন মাস, জুলাই শুধুই জুলাই। কিন্তু যদি কোনও মাসের নাম বাংলায় বলা হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেই মাসটি আমি অনুভব করতে পারি। বৈশাখ মানে শুধু কাঠফাটা রোদ নয়, তার সঙ্গে আকাশের কোনায় কালো মেঘ, কালবৈশাখী। আষাঢ় কিংবা শ্রাবণ মাসে ঝরঝর করে বৃষ্টি হচ্ছে, অগ্রহায়ণ মাসে শীত আসি আসি করছে। ধান কাটা শুরু হয়েছে, বাতাসে ধান মাড়াইয়ের গন্ধ! এরকম প্রত্যেকটা বাংলা মাসের নাম শুনে আমি সেটা অনুভব করতে পারি, কিন্তু ইংরেজি মাস থেকে আমি সেগুলো পাই না।

এখানেই শেষ নয়। অনেকেই জানেন না, বুঝে হোক না বুঝে হোক সারা পৃথিবীর মানুষ প্রেম ভালোবাসার জন্য কিন্তু বাংলা মাসকে ব্যবহার করেন! ১৪ই ফেব্রুয়ারি হচ্ছে ভ্যালেন্টাইন দিবস, কেউ কি কখনও চিন্তা করে দেখেছেন, কেন ১৪ই ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন কিংবা ভালোবাসা দিবস? তার কারণ, এটি হচ্ছে আমাদের বাংলা ক্যালেন্ডারের বসন্ত ঋতুর প্রথম দিন! সারা পৃথিবীতেই শীতের শেষে বসন্তকালকে ভালোবাসার কাল বলে ধরে নেওয়া হয়। সেই হিসেবে বসন্তের প্রথম দিনটি ভালোবাসার দিন হিসেবে ধরে নেওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু সেই বসন্ত ঋতুটি অন্য দেশের নয়, আমাদের বাংলা ক্যালেন্ডারের বসন্ত ঋতু!

শুধু যে প্রেম ভালোবাসার জন্য বাংলা ক্যালেন্ডার ব্যবহার করা হয় তা নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞান করার জন্যও কিন্তু বাংলা ক্যালেন্ডার ব্যবহার করা হয়। গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান নির্দিষ্ট করার জন্য পুরো আকাশটিকে ১২টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই বৈজ্ঞানিক বিভাজনটির নামগুলো আমরা জ্যোতিষীচর্চা নামে একটি পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের কারণে জেনে গেছি, যেটাকে আমরা রাশিচক্র বলে থাকি। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট ইত্যাদি নামে যে রাশিচক্র আছে সেগুলো আসলে আকাশের বিভাজন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো আকাশে পরিবর্তিত হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, কোন রাশিটি কখন আকাশে উঠবে সেটি কিন্তু আমাদের বাংলা ক্যালেন্ডার দিয়ে নির্ধারিত। কিংবা উল্টোটা বাংলা ক্যালেন্ডারটিই হয়তো একসময় এই জ্যোতির্বিজ্ঞানিক বিভাজন দিয়ে ঠিক করে নেওয়া হয়েছিল!

যাই হোক, আমি এ বিষয়ের গবেষক নই, সেজন্য বাংলা ক্যালেন্ডার নিয়ে আমার এই উচ্ছ্বাস যদি একটি বেশি হয়ে থাকে তাতেও আমার কোনও সংকোচ নেই। তবে মোটামুটি জোর দিয়ে আমি একটা বিষয় সবাইকে মনে করিয়ে দিতে পারবো। আমাদের দেশে ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন মানেই খানিকটা উদ্দাম ঝাঁপাঝাঁপি। আজকাল এমন অবস্থা হয়েছে যে পুলিশ র‌্যাব

রীতিমত ঘোষণা দিয়ে রাস্তাঘাটে ইংরেজি নববর্ষ পালন বন্ধ করার চেষ্টা করছে। সেই তুলনায় বাংলা নববর্ষ অনেক মধুর। আমরা খুব ভোরবেলায় খুবই কোমল পরিবেশে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে দিনটি পালন করি! কোনও একজন তরুণ কিংবা তরুণী যদি বলে সে বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠানে যাচ্ছে তাহলে কেউ ভ্রু কুচকে তার দিকে তাকায় না।

৩.

আমি আসলে বাংলা নববর্ষের একটি বিষয় নিয়ে আলাদাভাবে কথা বলতে চাইছিলাম, বিষয়টি আমি নিজে অনেকদিন থেকে লক্ষ্য করে এসেছি। কিছুদিন আগে যখন একটা অনুষ্ঠানে শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম সেখানে আগরতলার একজন বুদ্ধিজীবীও আমাকে ঠিক এ বিষয়টির কথা বলেছিলেন। সেই বিষয়টি হচ্ছে, বাংলা নববর্ষের তারিখ। সবাই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক বাংলা নববর্ষের তারিখের সঙ্গে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বাংলা নববর্ষ, কিংবা পাহাড়িদের বর্ষবরণের তারিখটি কিন্তু মেলে না। শুধু তা-ই না, পশ্চিমবঙ্গ কিংবা আগরতলার বাঙালিদের নববর্ষও আমাদের সঙ্গে মেলে না। শান্তিনিকেতনে আগরতলা থেকে আসা সেই বুদ্ধিজীবী ভদ্রলোক আমাকে অনুরোধ করে বলেছিলেন আমি যেন বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষকে বলি তারা যেন পৃথিবীর সব বাঙালিকে নিয়ে বাংলা নববর্ষটি উদযাপন করেন। (স্কুল কলেজের শিক্ষকদের বেতন কিংবা পেনশন আটকে গেলে তারা অনেক সময় আমাকে এসে অনুরোধ করেন আমি যেন পত্রপত্রিকায় একটু লিখি। আমি এখন পর্যন্ত কাউকে বোঝাতে পারিনি পত্রপত্রিকার লেখালেখি কেউ পড়ে না, পড়লেও সেটাকে কোনও গুরুত্ব দেয় না। যেভাবে চলছে সেভাবে চললে কিছুদিন পর দেখা যাবে পত্রপত্রিকা কিংবা টেলিভিশন, এই বিষয়গুলোই দেশ থেকে উঠে গেছে!)। তবে বাংলা নববর্ষ নিয়ে পৃথিবীর বাঙালিদের মাঝে এই বিভাজনটি কিন্তু সত্যি সত্যি একটি হৃদয়বিদারক ব্যাপার। আমাদের দেশের সব ধর্মের, সব কালচারের, সব মানুষের সর্বজনীন এই একমাত্র দিনটি কবে পালন করবো সেটি নিয়ে কেন আমরা সবাই একমত হতে পারবো না?

আমি যে বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের সঙ্গে একেবারে কথা বলিনি তা নয়। তারা আমাকে বুঝিয়েছেন, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের অনেক বড় বড় বিশেষজ্ঞদের নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা করে এই তারিখটি নির্ধারণ করা হয়েছে। এই তারিখটি অনেক বিজ্ঞানসম্মত এবং এটাই সঠিক তারিখ। তারিখটি যতই বিজ্ঞানসম্মত হোক না কেন যদি সবাই এটা মেনে না নেন তাহলে সেটি তো আমাদের সত্যিকার উদ্দেশ্যটি বাস্তবায়ন করতে পারলো না।

একটি ক্যালেন্ডারের একমাত্র বিজ্ঞান হচ্ছে: পৃথিবীর তার কক্ষপথে পুরো সূর্যটা ঘুরে আসতে ৩৬৫.২৪২২ দিন সময় নেয়। সংখ্যাটি যেহেতু অখণ্ড ৩৬৫ নয় তাই চার বছর পর পর একটা লিপইয়ার দিয়ে একটি দিন বাড়াতে হয়। সেটা আবার একটুখানি বেশি হয়ে যায়, তাই একশ’ বছর পর পর লিপইয়ার ছাড়া একটি বছর পালন করতে হয়। সেটাও পুরোপুরি নিখুঁত নয়, তাই চারশ’ বছর পর পর আবার একটা লিপইয়ার দিয়ে সেটা ঠিক করতে হয়।

কেউ যদি এই নিয়মটা মেনে একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করেন তাহলে আগামী কয়েক হাজার বছর ক্যালেন্ডারটি কাজ করে যাবে! অর্থাৎ ধীরে ধীরে বৈশাখ মাসে হাড় কাঁপানো শীত চলে আসবে না এবং কোনও একসময় মাঘ মাসে কাঠফাটা রোদে কাউকে সিদ্ধ হতে হবে না। (এ ধরনের একটা ত্রুটি শোধরানোর জন্য পোপের নির্দেশে একবার ক্যালেন্ডার থেকে পুরো দশ দিন উধাও করে দেওয়া হয়েছিল!)

যাই হোক, আমি মনে করি একটা ক্যালেন্ডারের একমাত্র বৈজ্ঞানিক বিষয়টি ঠিক রেখে, বাংলাদেশের যত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তারিখ রয়েছে তার ভেতর যতটা সম্ভব সেগুলো অক্ষুন্ন রেখে পৃথিবীর সব বাঙালির কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নববর্ষ পালন করা উচিত, যেন নববর্ষ নিয়ে কখনও কোনও বাঙালির আর মন খারাপ না হয়। আমি নিশ্চিতভাবে জানি, আগরতলার একজন বাঙালির (যিনি মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করার জন্য কাজ করেছিলেন) এ নিয়ে বুকের মাঝে একটুখানি কষ্ট আছে। যে বিশেষজ্ঞরা আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তারা আবার বসতে পারেন, আবার আলাপ-আলোচনা করতে পারেন। একুশে ফেব্রুয়ারিতে মাতৃভাষার জন্য ভালোবাসাটুকু দিয়ে সারা পৃথিবীর সবাইকে আমরা একটি বন্ধনে নিয়ে এসেছি। আমাদের অপরূপ বাংলা ক্যালেন্ডারটি তাহলে কেন বন্ধন তৈরি না করে বিভাজন তৈরি করবে?

৪.

২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের কথা বলার সময় অনেক সময়েই বলে থাকি যে শুধু আমরাই ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছি। কথাটি পুরোপুরি সত্যি নয়। যখন কোনও জাতিকে পদানত করতে হয় তখন প্রথম আঘাতটি করা হয় ভাষার ওপর। তাই ইতিহাসে ভাষার ওপর আঘাতের এবং তা প্রতিরোধের অনেক উদাহরণ আছে। আমার মনে হয় ভাষা নিয়ে ইতিহাসের সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছিল ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুন সাউথ আফ্রিকায়।

সেখানে প্রায় ২০ হাজার কালো ছাত্রছাত্রীর ভাষা আন্দোলনে শ্বেতাঙ্গ পুলিশ গুলি করেছিল। অসংখ্য স্কুলছাত্রকে মেরে ফেলেছিল। সরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা ১৭৬, বেসরকারি হিসাবে ৭০০ থেকে বেশি।

আমাদের বাংলা ভাষার জন্যও কিন্তু শুধু আমরা রক্ত দিইনি। আসামে শুধু অসমিয়া ভাষাকে দাফতরিক ভাষা করার প্রতিবাদে বাঙালিদের আন্দোলনে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মে পুলিশের গুলিতে ১১ জন মারা গিয়েছিল। তার মাঝে একজন ছিল ১৬ বছরের কিশোরী কমলা। মাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে এসে বড় বোনের শাড়িটি পরে আন্দোলনে অংশ নিতে এসে গুলি খেয়ে সে শহিদ হয়েছিল।

আমরা যখন একবার আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম তখন সেই ১১ জন ভাষা শহিদের স্মৃতিতে তৈরি করা শহিদ মিনারটিতে ফুল দিতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে আমার একটু কষ্ট লেগেছিল, আমরা যেভাবে আমাদের ভাষা শহিদদের স্মরণ করতে পারি তারা সেখানে সেভাবে পারে না। এমনকি তাদের শহিদ মিনারটিও তারা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে করার অনুমতি পায়নি, বাইরে করতে হয়েছে।

২১ ফেব্রুয়ারিতে পৃথিবীর সব ভাষা শহিদকে আমি গভীর ভালোবাসায় স্মরণ করি। পৃথিবীর সবাই যেন তার নিজের ভাষায় কথা বলতে পারেন, শিখতে পারেন, গান গাইতে পারেন, ভালোবাসতে পারেন, এমনকি মান অভিমান করতে পারেন। মাতৃভাষা তো শুধু আমার ভাষা নয়, এটি আমার আরও একজন মা!

লেখক: কথা সাহিত্যিক।

মধ্যে অন্যতম হলো বাংলা। শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং দেশ গঠনে প্রায় পাঁচ হাজারের বেশি বাংলাদেশি সৈনিকদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০২ সালের ১২

বর্তমানে বহির্বিশ্বের ৩০টি দেশের প্রায় ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়ানো হয়। রবীন্দ্র রচনাবলির ৩০ খন্ড চীনা ভাষায় অনুবাদ হওয়া থেকে শুরু করে লালনের গান ও দর্শন

ডিসেম্বর সিয়েরালিওনের প্রেসিডেন্ট ডঃ আহমেদ তেজান কাব্বা বাংলা ভাষাকে সিয়েরালিওনের সরকারি ভাষা (সম্মানসূচক) হিসেবে ঘোষণা করেন।
ইন্টারন্যাশনালাইজড ডোমেইন নেম ((IDM) একটি ইন্টারনেট ডোমেইন নেম সিস্টেম, যা ওয়েব ঠিকানা লিখতে প্রচলিত ইংরেজি ভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষা সমর্থণ

জাপানি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। কয়েক দশক ধরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা অদিতি লাহিড়ী বাংলা রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করছেন। বিশ্বের ছয়টি দেশের রাষ্ট্রীয় বেতারে বাংলা ভাষার আলাদা চ্যানেল রয়েছে। বাংলা ভাষায় যুক্তরাজ্য থেকে মোট ১২টি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হয়। ধূমকেতু, জন্মভূমি, প্রতিদিন, স্বদেশ-

সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন, বাংলাদেশে জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক বা ছাত্র বা বাংলাদেশের সাহিত্যিক শিল্পী কারো বিশিষ্ট দায়িত্ব নয়। তাদের জন্য এটা কোন সমস্যাও নয়। কেননা, তারা তো বাংলাতেই চিরকাল আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং এখনো করে থাকেন। বস্তুতঃ স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা প্রচলন সকল বাঙালির কর্তব্য। যখন দেশের সকলেরই ঐ কর্তব্যবোধ জাগবে তখন প্রচলনের প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণে ও তার বাস্তবায়নে কোন দ্বন্দ্ব আর থাকবে না। যেহেতু সকলের মনে কর্তব্যবোধ জাগেনি সেহেতু লুকোচুরি চলছে।

এখন দেখা যাক, কারা বাংলা ব্যবহার করছেন, এবং কারা করছেন না। লক্ষ্য করা যাবে, আমাদের দেশে উৎপাদনে যাঁরাই নিয়োজিত আছেন তাঁরা সকলেই বাংলা ব্যবহার করছেন আর যাঁরা সৃজনশীলতা ও উৎপাদনে যুক্ত নন তাঁরা বাংলা ব্যবহার করছেন না। যেমন কবি-সাহিত্যিক শিল্পী এবং বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁরা সৃজনশীল তাঁরা বাংলা ব্যবহার করছেন। তাছাড়া সম্পদ উৎপাদনে যাঁরা নিয়োজিত অর্থাৎ শ্রমিক ও কৃষক তাঁরা সর্বদাই বাংলা ব্যবহার করছেন। এর বাইরে যাঁরা অর্থাৎ যাঁরা না সৃজনশীল না সম্পদ উৎপাদনে সমর্থ তাঁরা কেবল তাঁরাই বাংলা ব্যবহার করছেন না। বস্তুতঃপক্ষে তাঁরা একধরনের পরাধীন মানসিকতায় ভুগছেন এবং এর একটা পটভূমি আছে।

স্মর্তব্য যে, স্বাধীন মানুষের কর্তব্যবোধ আর পরাধীন মানুষের কর্তব্যবোধে পার্থক্য থাকে এবং একথা সত্য জোর করে কাউকে স্বাধীন করা যায় না। স্বাধীনতা নিজের ভেতরে থেকে উপলব্ধি করতে হয়। হাজার বছরের অধিককাল বাঙালি পরাধীন ছিল এবং হাজার বছর ধরে চাকরি প্রার্থী বাঙালি সব সময়ই শাসকের ভাষা শিখেছেন। সে-ভাষা কখনো সংস্কৃত, কখনো পার্সি, কখনো ইংরেজি, কখনো হিন্দি কখনো উর্দু। ফলে শাসক বদলের সঙ্গে ভাষা বদল যখনই হয়েছে তখনই প্রশাসকের সঙ্গে যুক্ত চাকরিজীবী বাঙালি বিপন্ন বোধ করেছেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা দেওয়ান কার্ত্তিক চন্দ্র রায় পার্সিতে সুদক্ষ ছিলেন। বিপন্ন বোধ করেছিলেন তার পরিচয় আছে তাঁর আত্মজীবন-চরিতে। কিন্তু যখন রাজভাষা পার্সির বদলে ইংরেজি হল তখন দেওয়ান সাহেব যে কতদূর।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজের বদলে যাঁরা শাসকের আসনে বসলেন তাঁরা শাসক সুলভ স্বভাবেই তাঁদের নিজেদের ভাষা উর্দু চাপিয়ে দিতে চাইলেন বাঙালির ঘাড়ে কিন্তু ঐ ঘটনার আগে নব্য শাসকেরা একটা ভুল করে ফেলেছিলেন বাঙালিকে বুঝিয়েছিলেন যে, ইংরেজ চলে গেলে বাঙালিরা স্বাধীন হবে। ব্যাপারটা নতুন ছিল। কেননা, তার আগে বাঙালিরা, স্বাধীনতা দেখেনি। পরাধীনতার শর্ত চাকরি প্রার্থী বাঙালির জানা ছিল শাসকের ভাষা শিখতে হবে। সেই সঙ্গে বাঙালির চোখে ছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন। তাই ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই আগস্টের স্বাধীনতার পর আবার পরের ভাষার দাসত্বের প্রশ্ন উঠলে চাকরি প্রার্থী বাঙালির কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। শত শত বছর পর ভাষাভাষীয় গোলামী করে বাঙালি এটুকু হাড়ে হাড়ে বুঝেছিল যে, স্বাধীনতার একটা অতি আবশ্যিক শর্ত শিক্ষা, চাকরি ও ব্যবহারিক জীবনে পরের ভাষার দাসত্ব থেকে মুক্তি এবং নিজের ভাষা ব্যবহারের স্বাধীনতা লাভ।

স্বাধীনতার অপর শর্তসকল মানুষের সমান অধিকার। সকল প্রশ্নে, বিশেষতঃ ভাষার প্রশ্নে। ১৯৫২-র ২১ শে ফেব্রুয়ারির পরও, তৎকালীন পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও, পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবে এ দাবি বাঙালিরা করেনি; বলেছে, 'সকল ভাষার সমান অধিকার।' বাঙালি স্বাধীনতার অর্থ বুঝেছিল বলেই এ কথা বলেছিল। এই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তৎকালীন শাসকদের থাকার কথা নয়। উল্লেখযোগ্য যে, যেসব অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান হয়েছিল সেসব অঞ্চলের ভাষা ছিল বাংলা, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, পশতু ও বালুচি। উর্দু ঐ সব অঞ্চলের কারো ভাষা ছিল না। ভারতীয় ভাষা উর্দু পাকিস্তানের মূল জনসাধারণের কারো ভাষা ছিল না। তা ছিল পাকিস্তানি শাসকদের ভাষা। যারা মোহাজের হয়ে এলেন তারা যেখান এলেন সে এলাকার জনসাধারণের সঙ্গে মিশে না যেয়ে, তাদের ভাষা না শিখে, কতিপয় শাসক আমলার গাজর-লাঠি নীতির কারণে উর্দুর দিকে ঝুঁকে থাকলেন।

রাষ্ট্র ভাষাভাষী নিজেদের দেশের অন্য ভাষাভাষীদের তুলনায় উন্নততর ভাবে। তাই মোহাজেরদের কোন কোন নেতা এবং উর্দু রপ্ত করে কোন কোন বাঙালি নিজেদের শাসক দলভুক্ত ভাবতে লাগলেন। এর পরিণাম কি হয়েছে তা সকলের জানা । বায়ান্ন সালে ভাষা আন্দোলন করে বাঙালিরা স্বাধীনতার একটি মৌল শর্তকে সুচিহ্নিত করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা সম্ভবত সেই প্রথম। পাকিস্তান বাঙালিরা এনেছিল এবং পাকিস্তানের প্রথম বৎসরেই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বিপন্ন হতে দেখে বাঙালিরা রুখে দাঁড়িয়েছিল। নিজের ভাষার অধিকার ছাড়া জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব থাকে না। স্বাধীনতার প্রশ্নে বাঙালির অনমনীয়তা উপলব্ধি করে পাকিস্তানি শাসকেরা এরপর নানা ঘোরপ্যাঁচের পথ ধরলেন। বাংলা ভাষার ওপর আরবি হরফ, রোমান হরফ, শওজা-বাংলা প্রভৃতি চাপাবার নানা চক্রান্ত একটার পর একটা ব্যর্থ হওয়ায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কি কি দৈন্য সেসব প্রসঙ্গ নিয়ে সরকারি অর্থে ও আনুকূল্যে সেমিনার সিরিজ আরম্ভ হল, 'ইংরেজি'-পণ্ডিদের উদ্যোগে।

ইংরেজি-পণ্ডিতদের উৎসাহের মূলে ছিল একটি কারণ। পাকিস্তানি শাসকরা যখন বুঝলেন বাঙালিদের ঘাড়ে উর্দু চাপানো যাবে না এবং কাগজে-কলমে বাংলাকে স্বীকার করতেই হবে তখন তারা সিদ্ধান্ত দিলেন উর্দু ও বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র পরিচালনার প্রয়োজনীয় মাত্রায় উন্নয়ন ('ডেভেলপ') করান হবে এবং 'অন্তবর্তীকালে' ইংরেজি চলবে। যতদূরে বোঝা যায় ২০ বৎসর পর পর অন্তবর্তীকাল ২০ বৎসর করে বাড়ানো হবে এ রকম একটা পরিকল্পনাও পাকিস্তানি শাসকদের মগজে হয়ত ছিল। (পাকিস্তানের ১৯৫৬ ও ১৯৬২

খ্রিস্টাব্দের সংবিধান দ্রষ্টব্য।) এভাবে মহান ভাষা আন্দোলনের কারণে উর্দুকে বসাতে না পেরে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে পাকিস্তানি শাসকেরা ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের আয়োজন করলেন। এর বিপরীতটা ঘটল ভারতে। শোনা যায়, যেখানে রাষ্ট্রভাষা হিন্দির গতিরোধ করার জন্য বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী ইংরেজি আঁকড়ে ধরলেন। এভাবে দুই বিপরীত কারণে সমগ্র উপমহাদেশে সৃষ্টি ক্ষমতাহীন 'ইংরেজি'- পণ্ডিতদের লম্ফঝম্ফ বেড়ে গেল। বহু আত্মদানের বিনিময়ে যে ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খল মুক্তির ও ঔপনিবেশিক ভাষার দাসত্ব থেকে উপমহাদেশে জনসাধারণ স্বাধীন হতে চেয়েছিল দুই বিপরীত কারণে সেই ঔপনিবেশিক ভাষা আবার তাদের ঘাড়ে চেপে বসল।

এখন দেখা যাক, আমাদের ইংরেজি ভাষা চর্চার স্বরূপ কি ? বলাবাহুল্য, উপমহাদেশে বাঙালিরাই সর্বপ্রথম ইংরেজি ভাষা শিখেছে এবং বাঙালির ইংরেজি ভাষাচর্চার ইতিহাস প্রায় দুই-শতাধিক বৎসরের। এই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা কি ?

কবিতায় মধুসূদন এবং উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সাধনার প্রথম পর্বে ইংরেজি ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন; তাদের পটভূমি অবশ্য ভিন্ন ছিল। মধুসূদনের স্বপ্ন ছিল ইংরেজি ভাষার কবি হিসেবে তিনি অক্ষয় কীর্তি রেখে যাবেন। দীর্ঘকাল, প্রায় দশ বৎসর, ইংরেজি ভাষায় কাব্যচর্চার পর যখন ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ থেকে 'দি ক্যাপটিভ লেডি' প্রকাশিত হল কলকাতার ইংরেজ বিদগ্ধসমাজ কোন উচ্চবাচ্য করল না। ডিঙ্কওয়াটার বেথুনকে বই পাঠালেন কবি, বন্ধুর মাধ্যমে। বেথুন সাহেব কবিকে মাতৃভাষার সেবায় আত্মনিয়োগের পরামর্শ দেন। বাংলাভাষার চর্চায় মনোনিবেশ করে মধুসূদন অত্যল্পকালের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ কবির যোগ্য অক্ষয় অবদান রেখে যেতে সমর্থ হলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট (১৮৫৮)। বঙ্কিমচন্দ্র নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বি.এ. পরীক্ষায় যে ১০ জন ছাত্র অবতীর্ণ হয়েছিল তারা সকলেই অকৃতকার্য হন। তাঁদের মধ্যে যে দুজন ছাত্র একটি বিষয়ে অনুর্ধ্ব সাত নম্বর কম পেয়েছিলেন সে দু'জনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, সম্ভবত প্রথম বৎসর বলে, সাত নম্বর গ্রেস দিয়ে পাশ করাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (এবং সেই থেকে গ্রেস নম্বর দেয়া রেওয়াজে পরিণত হয়)। পাশ করানো ঐ দু' জনের মধ্যে প্রথম হলেন বঙ্কিমচন্দ্র (সিন্ডিকেট মিনিট, ২৪ এপ্রিল ১৮৫৮) এবং প্রায় তৎক্ষণাৎ তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্তি লাভ করেন। (৭ আগস্ট ১৯৫৮)। কিন্তু দীর্ঘ ৩৩ বৎসরের (৭/৮/১৮৫৮-১৪/৯/১৮৯১) কর্মজীবনের চার মাস বাইশ দিনের (৪/৯/১৮৮১- ২৬/১/১৮৮২) অস্থায়ী

এ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারির পদ ব্যতীত উচ্চতর পদে তিনি আর কখনো উন্নীত হননি। যদিও ঈশ্বরগুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত। তবু কলেজে ইংরেজি পাঠাভ্যাস কালে তিনি বাংলায় লেখা প্রায় সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন এবং ১৮৫৩ থেকে ১৮৬৫ অর্থাৎ কলেজ জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর (১৮৫৩-৫৮) এবং চাকরি জীবনের প্রথম সাত বৎসর (১৮৫৮-৬৫) এই বারো বৎসর তিনি বাংলা চর্চা থেকে বিরত থাকেন। তাঁর তৎকালীন মনোভাব প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল সোশাল সায়েন্স এ্যাসোসিয়েশন প্রদত্ত ইংরেজি বক্তৃতায় এবং ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় বেনামে প্রকাশিত ইংরেজি প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য করেন। বলাবাহুল্য মধুসূদনের মত বঙ্কিমচন্দ্রও ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য সাধনায় ব্যর্থ হয়ে বাংলাভাষায় সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং অক্ষয় কীর্তি রেখে যান ।

মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসূরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষাতেই আজীবন অচঞ্চল সাধনা করেছিলেন। একদিন নিজের কিছু বাংলা রচনা ইংরেজিতে রূপান্তর করে 'ইংরেজি ভাষার প্রচ্ছদে স্বীয় কাব্য চিন্তা প্রকাশের জন্য' পেলেন নোবেল জাপানি, চিনা, কোরীয় ইত্যাদি বিচিত্র ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে বিশ্বসাহিত্যের পুরস্কার। আজ বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহ ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, রুশ, সম্পদে পরিণত হয়েছে।

অন্যদিকে বাঙালির ইংরেজি চর্চার দুই শতাধিক বৎসরে অনেক বাঙালি ইংরেজি ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন। অনেকেই ব্রিটেনের ও আমেরিকার বিখ্যাত সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন এবং বিগত শতাধিক বৎসরে বহু জাঁদরেল ইংরেজি প্রফেসর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও আমাদের ইংরেজি পণ্ডিতদের কোন মন্তব্য, কোন বাক্য ইংরেজের লেখা ইংরেজি কলেজসমূহ অলঙ্কৃত করেছেন। এতদসত্ত্বেও একটা কথা বড় মর্মান্তিক সত্য যে, সাহিত্যে কি ইংরেজি সমালোচনার কোন প্রামাণ্য ইতিহাসে কোন প্রকার স্বীকৃতি লাভ করেনি। এই অতি স্বাভাবিক বিপুল ব্যর্থতার পটভূমিতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পরবর্তী উপমহাদেশে ইংরেজি চর্চার ভণ্ডামী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলাদেশে ইংরেজি চর্চার সাম্প্রতিক রূপও বড় করুণ। কিছুকাল আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গঠিত বাংলাদেশের ইংরেজি শিক্ষকদের অবস্থা সম্পর্কে এক জরিপ পরিচালিত হয়। তার রিপোর্টের কিছু তথ্য সম্প্রতি (১৯৭৭) সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান, প্রফেসর এ. জি স্টকের স্মৃতি কথায় উল্লিখিত একটি মন্তব্য। দীর্ঘদিনের

অভিজ্ঞতার আলোকে মিস স্টক লেখেন যে, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরেজি সাহিত্য বাংলা মাধ্যমে পড়ালে সুফল পাওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা।

ভারতে হিন্দির বিরুদ্ধে ইংরেজি দেয়াল তুলে তথাকথিত প্রতিরোধের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কেননা এক পরভাষা দিয়ে অপর পরভাষা রোধ করা যায় না। পাকিস্তানের স্থানীয় লোকদের পরভাষা উর্দুর স্বার্থেই ইংরেজি ঐ দেশের ওপর তলায় আসন পেতেছে। ভাষা আন্দোলনের ঐতিহ্য ছিল বলে পাকিস্তানের ইংরেজি চক্রান্তে বাঙালিরা বিভ্রান্ত হয়নি। ভাষা আন্দোলনের থেকে ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতার আন্দোলন এবং সবশেষে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছে।

জীবনের সর্বস্তরে বাংলাভাষার প্রচলন আজ বাংলাদেশের সকল নাগরিকের সাংবিধানিক দায়িত্ব। তবু আজো বিভ্রান্তির ধূম্রজাল যথেষ্ট। আজ তাই সঙ্গত প্রশ্ন বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার বিকাশকে কতকাল রুদ্ধ করা হবে? যোগ্যতার অভাব কতকাল ঢেকে রাখা যাবে অক্ষম বিদেশি ভাষাজ্ঞানের ভঙ্গিসর্বস্ব আগাছা পরগাছার বেড়াজাল তুলে? স্বাধীন দেশে শিক্ষার লক্ষ্য মানুষের সৃজনশীলতার বিকাশ সাধন তাকে স্বনির্ভর হতে শেখানো। আমরা তো জানি সাধারণ মানুষের সংগ্রামশীল যে জীবন প্রবাহ তার সঙ্গে একাত্ম হতে না পারলে নগরের বিলাস- সর্বস্ব পরগাছা জীবনের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। গ্রামের লোক অন্ধকারেই থাকবে আর কতিপয় নগরবাসী ইংরেজি বোলচাল রপ্ত করে তাদের ওপর কর্তৃত্ব করেই যাবে এই স্বপ্ন যে অসম্ভব, অবাস্তব, ন্যাক্কারজনক ও হাস্যকর তা কে না জানে! অথচ নগরে-শহরে এমন কিছু অভিভাবক রয়েছেন যাঁদের একমাত্র দুঃখ সম্ভবত এই যে, ছেলে-মেয়ে কেন জন্মেই ইংরেজি বলে না। তথাকথিত ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল এই জাতীয় অভিভাবকদের অপরিসীম গ্রাম্যতা ও হীনমন্যতার সুযোগ নিয়ে ব্যবসা ফেঁদে থাকে। জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার যথাযথ মনোযোগের অভাবের ছিদ্রপথেই এটা ঘটছে। পরিকল্পনাহীনভাবে কোন স্বাধীন জাতির বিকাশ সম্ভব নয়। পরিকল্পনা নির্ভরশীল জাতীয় লক্ষ্যের উপর। শিক্ষা পরিকল্পনায় জাতীয় লক্ষ্যে উত্তরণের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজনই অভিষ্ট। এই সত্য জানা যায় সত্ত্বেও আমরা বারংবার পরিকল্পনার বর্ণ পরিচয়ে ঘুরছি কেন ? এর কারণ কি এই যে তাৎক্ষণিক লক্ষ্য জাতীয় লক্ষ্যের উপরে গুরুত্ব পেয়ে যায় ? হয়ত বা 'জাতীয় লক্ষ্য' কথাটা বহুলাংশে বিমূর্ত এবং তাৎক্ষণিক লক্ষ্য অর্থাৎ ব্যক্তিগত লক্ষ্য অনেক বেশি বাস্তব ও প্রত্যক্ষ। তাই-কি তাৎক্ষণিক লক্ষ্যের প্রাধান্য খুবই স্বাভবিক ? হয় তবা এই কারণেই জাতীয় প্রসঙ্গে অনেক বায়বীয় ও বিমূর্ত

কথা প্রায় সবাই বলেন এবং ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে প্রায় কারোই হিসেবে ভুল হয় না। স্বার্থের ঊর্ধ্বে সেবা নয়, সেবার ঊর্ধে স্বার্থ যেখানে মোক্ষ সেখানে তো অপ্রত্যাশিতও নয়।

সুতরাং স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা যাক। আমাদের এ-যাবৎ জাতীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, যাঁরা আমাদের জন্য পরিকল্পনা করেন তাঁরা পরিকল্পনা প্রণয়নের কিছু আগে-পরে ভিন্ন দেশে চাকরি গ্রহণ করে। অর্থাৎ ঐ পরিকল্পনা তাঁরা আমাদের ও আমাদের সন্তানদের জন্য করেছেন; নিজেদের বা আপন সন্তানদের জন্য করেননি। যে-কাজের দায়-দায়িত্ব নেই, যে-কাজের পরিণাম নিজের ভবিষ্যৎকে স্পর্শ করে না, নিজের স্বার্থ বিঘ্নিত করে না, সে-কাজ যে অন্য সকলের স্বার্থ বিঘ্নিত করবেই তা বলাবাহুল্য। সুতরাং কি নৈতিক, কি অর্থনৈতিক, কি রাজনৈতিক, কি শিক্ষা সকল বিষয়ে পরিকল্পকদের কাছে বিনীত নিবেদন নিজের ও নিজের সন্তানের জন্যই পরিকল্পনা করুন। যদি আপনার সন্তানের স্বার্থ আপনার পরিকল্পনার সাথে জড়িত না থাকে তবে ঐ পরিকল্পনা আমাদের কারো কোন কাজে আসবে না।

কারো ভালো লাগুক বা না-ই লাগুক একথা সত্য যে বাংলা ভাষার জন্য আত্মদানের ও আন্দোলনের পথ-ধরে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং জীবনের ও শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সে প্রতিশ্রুতি পালনে যিনি যেখানে যতটুকু ব্যর্থ হচ্ছেন ভবিষ্যতের বাংলাদেশের নাগরিকদের কাছে তিনি অবশ্যই ততটুকু নিন্দিত হবেন। সে নিন্দা এড়ানো যাবে না। অথচ জীবনের ও শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের কোন কার্যকর পদক্ষেপ আজো গৃহীত হয়নি বরং সৃষ্টি হয়েছে নানা কুয়াশা ও ধূম্রজাল।

শিক্ষা কার জন্য ও কেন ? স্বাধীন দেশের শিক্ষা স্বাধীন জাতির আত্মবিকাশের সকল ক্ষেত্রে সুদক্ষ কর্মী সৃষ্টির জন্যে। প্রতিটি মানুষের প্রতিভা-বিকাশের জন্যে। আমাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ একটি স্বাধীন জাতির ঋজু ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা। সুতরাং এ শিক্ষা কিছুতেই শুধু রফতানীমুখী হতে পারে না। আমাদের সন্তানেরা দেশের কোন কাজে না লেগে বিদেশের ধনী সমাজের ভৃত্য হবে এটা কখনই আমাদের কাম্য হতে পারে না। অথচ আজ ঐ ধরনের মানসিকতা বিভ্রান্তি বাড়াচ্ছে। ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিহীন, চিন্তাশক্তি রহিত ধনোন্মাদনা ভুলিয়ে দিচ্ছে পায়ের নিচের মাটিকে। এর পরিণাম জাতির জন্য শুভ হতে পারে না। এবং যা জাতির জন্য অশুভ তা ব্যক্তির জন্যও অশুভসার্থবন্দী সমাজের জন্যও একথা সত্য।

উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত বাংলা মাধ্যমের শিক্ষা ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমে শিক্ষা বাংলাদেশের জন্য কল্যাণের হতে পারে না এই সত্য-বিস্মৃতি নিরর্থক কালক্ষয় ব্যতীত আর কিছু নয়। আমাদের উচিত ঐ-লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ
।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অমর একুশ ও বাংলা ভাষা প্রয়োগের বাস্তবতা

ড. মিল্টন বিশ্বাস

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ৭০ বছর পর আমরা রাষ্ট্রভাষা বাংলার মান ও মর্যাদা নিয়ে কথা বলছি, নির্ভুল বানানে বাংলা লেখার জন্য তর্কবিতর্কে লিপ্ত হচ্ছি আর হরহামেশাই ভুলে ভরা বাংলা লেখা নিয়ে খেদোক্তি করছি। আসলে বঙ্গবন্ধুসহ ভাষাসৈনিকদের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের যে অভিপ্রায় ছিল তার অনেক কিছু আজও অপূর্ণ রয়ে গেছে। আমরা সবাই জানি, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সফল হলেও মাতৃভাষা বাংলাকে সর্বস্তরে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টির প্রচেষ্টা পাকিস্তান আমলে মুখ থুবড়ে পড়েছিল।

যদিও ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু কাগজে-কলমে বাংলাকে মর্যাদা

দিলেও বাঙালি সংস্কৃতি অবহেলিতই থাকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কাছে। স্বাধিকার আদায়ে দীর্ঘ সংগ্রামের পর বাঙালিরা লাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, জন্ম নেয় বাংলাদেশ। স্বাধীন দেশে সবার আশা ছিল সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার হবে। বিশেষ করে সরকারি দপ্তর, আদালত এসব স্থানে সাধারণ মানুষ বাংলায় কাজ চালাতে পারবে।

আসলে মাতৃভাষার মর্যাদার প্রতি তাদের যেন কোনো অঙ্গীকারই নেই। পৃথিবীর উন্নত জাতি তাদের নিজস্ব ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতির ব্যাপারে কোনো আপস করে না। কিন্তু আমাদের দেশে রক্তরঞ্জিত বাংলা বর্ণমালার অবমাননা দেখা যায় সর্বত্র। এক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়ায় বাংলা প্রয়োগে ভুলের রাজত্ব লক্ষণীয়।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যে বাংলা ভাষার ব্যবহার হচ্ছে তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তবে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়নি। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ মহল থেকে বাংলা ভাষার প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা থাকলেও বাংলাকে সর্বস্তরে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। অথচ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন। পরবর্তী রাষ্ট্র প্রধানরা বাংলায় ভাষণ দেননি।

বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলায় ভাষণ দেন এবং বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছেন। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বাংলার প্রচলন থাকলেও শিক্ষার্থীরা বাংলা বানান ও বাক্য প্রয়োগে হরহামেশাই ভুল করছে। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে ইংরেজি অবশ্যই জানতে হবে। এজন্য বাংলা ভাষার পাশে ইংরেজি শিক্ষারও প্রসার ঘটানো দরকার। তবে সবার আগে প্রয়োজন সর্বস্তরে মাতৃভাষার প্রয়োগ ত্বরান্বিত হওয়া।

আমাদের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ইউনেস্কো কর্তৃক ঘোষিত হয়ে ১৯৩টি দেশে দিবসটি উদযাপিত হয়ে আসছে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল রাষ্ট্রভাষার দাবি আদায়ের আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি। তাই বলা যায়, ভাষা শহিদদের রক্তে স্নাত হওয়া সত্ত্বেও ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য বর্তমান সময়ও আমাদের লড়াই থেমে নেই।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান থেকে প্রতি বছর বাংলা ভাষা ব্যবহারে সবাইকে বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে বাংলা শব্দের বানান ও উচ্চারণ সম্পর্কে আরও সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বলেন, 'ইদানীং বাংলা বলতে গিয়ে ইংরেজি বলার একটা বিচিত্র প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জানি না, অনেক ছেলেমেয়ের মাঝে এখন এটা সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে গেছে। এভাবে কথা না বললে যেন তাদের মর্যাদাই থাকে না- এমন একটা ভাব।'

শেখ হাসিনা আরও বলেছেন, প্রমিত বাংলা শব্দের বানান এবং উচ্চারণ সুনির্দিষ্ট। এখানে কোনো আপস চলবে না। বাংলা ভাষাকে মিশ্রিত বা বিকৃত করে বলার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। তবে আঞ্চলিক ভাষাকে কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না। কারণ, আঞ্চলিক ভাষাও বাংলা ভাষা, এর নিজস্বতা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কথার সূত্র ধরে বলা চলে কেবল নতুন প্রজন্ম নয়, সরকারি-বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানই বাংলার সঙ্গে ইংরেজি মিশিয়ে জনগণের কাছে বাংলার চেয়ে বিদেশি ভাষার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে চলেছে।

প্রযুক্তির কারণেও বাংলা ভাষা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ভাষাবিদ, কবি, সাহিত্যিক বা ব্যাকরণবিদরা নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করে ভাষাকে সমৃদ্ধ করেন। কিন্তু এখন অন্য ভাষার নাটক সিনেমা দেখে সাধারণ মানুষই মনের মতো করে শব্দ সৃষ্টি করছেন। ফলে নতুন প্রজন্ম এভাবেই ভুল শব্দ শিখছে। গণযোগাযোগ মাধ্যমেও প্রমিত বাংলার ব্যবহার অনেক কমে গেছে।

টেলিভিশনের সংবাদ বা উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এখনো অনেক কঠোর নিয়ম অনুসরণ করা হয়। কিন্তু রেডিওতে বর্তমানে তুমুল জনপ্রিয় আরজে নামক পদবিতে যারা কাজ করেন তাদের ভাষা শুনলে যেকোনো বিদেশি বিশেষ করে ইংরেজি ভাষার কোনো বিদেশি নির্ঘাত অজ্ঞান হয়ে যাবেন। তারা যেভাবে বাংলা উচ্চারণ করেন এবং এতে দু-একটা শব্দ পরপর ইংরেজি ব্যবহার করেন তাতে সাধারণ মানুষের ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়ার উপক্রম হয়।

গত কয়েক বছর ধরে বাংলা নাটকে প্রমিত বাংলার জায়গায় আঞ্চলিক ভাষা প্রাধান্য পাচ্ছে। অনেকে এর পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেন, এসব নাটকের মাধ্যমে আঞ্চলিক ভাষাগুলো জনপ্রিয় হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বাংলা নাটক যদি বলা হয় তাহলে সেখানে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহারই কাম্য। অন্যদিকে একটি জাতীয় দৈনিকে 'সরকারি প্রতিষ্ঠানের ইংরেজিপ্রীতি বেশি' শীর্ষক প্রতিবেদনে ইংরেজি শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার কীভাবে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির জন্য হুমকিস্বরূপ হয়ে উঠেছে তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

যেমন- বাংলায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন লেখা থাকলেও তার সংক্ষিপ্ত রূপ ইংরেজিতে 'ডিএনসিসি'। অর্থাৎ ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশন। ঠিক একই পদ্ধতিতে নাম ব্যবহার করছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনও (ডিএসসিসি)।

অথচ বাংলা ব্যবহার না করার অভিযোগে কোথাও কোথাও বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় প্রতিষ্ঠানের পরিচিতিমূলক সাইন বোর্ড। তাছাড়া হরহামেশা ইংরেজিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামকরণও করছে সরকারের ভেতরের কিছু ব্যক্তি। এভাবে বহু প্রতিষ্ঠানের বাংলা নামের পাশে সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে ইংরেজি শব্দের বিশদ ব্যবহার আছে যত্রতত্র।

যেমন- ইউনিয়ন পরিষদ 'ইউপি', অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন-বিআইডব্লিউটিসি, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন- ইউজিসি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড- এনসিটিবি, নগর উন্নয়ন অধিদফতর-ইউডিডি, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন- বিটিআরসি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড- এনবিআর, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন-বিআরটিসি, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ-ডিটিসিএ, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি- বিআরটিএ প্রভৃতি। এ ধরনের ব্যবহারের অন্যতম দৃষ্টান্ত হলো 'ওয়াসা'। 'ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড সুয়্যারেজ অথরিটি'র সংক্ষিপ্ত রূপ এটি। এ রকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে মানুষের মুখে মুখে বিদেশি শব্দ এভাবেই ছড়িয়ে যাচ্ছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই হুমকির মুখে পড়বে বাংলা শব্দ, যা জাতি সত্তার মৌলিক উপাদানের ওপর হুমকিস্বরূপ। যে কথা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন তা থেকে নিস্তার পেতে হলে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর এসব তৎপরতার অবসান ঘটানো দরকার। কারণ, কথায় কথায় এসব সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহার করছে সর্বস্তরের মানুষ, যা কেবল বাংলা ভাষা প্রয়োগের সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করছে না, এর মধ্য দিয়ে ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের প্রতি অসম্মান করা হচ্ছে বলে আমরা মনে করি।

উল্লেখ্য, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ১৬৯৬/২০১৪ নং রিট পিটিশনে প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী সব প্রতিষ্ঠানের (দূতাবাস, বিদেশি সংস্থা ও তৎসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র ব্যতীত) নামফলক, সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড, ব্যানার বাংলায় লেখা বাধ্যতামূলক। স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে হাইকোর্টের আদেশটি ডিএনসিসি এলাকায় নিশ্চিত করার দায়িত্ব ডিএনসিসি কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাতদিনের মধ্যে নামফলক, সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড, ব্যানার বাংলায় লিখতে বলা হয়। হাইকোর্টের আদেশ এবং ডিএনসিসির গণবিজ্ঞপ্তি বাস্তবায়ন না করার অপরাধে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ অনুযায়ী অনেক প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হলেও সরকারি অফিসগুলো ইংরেজি শব্দ নিয়েই বহাল তবিয়তে আছে।

কয়েক বছর আগে বিচারপতির পদত্যাগপত্রে বাংলা বানান ভুল নিয়ে হইচই হয়ে গেলো। আবার উপরের তথ্য থেকে আমরা দেখতে পেলাম সরকারি সাইনবোর্ড, রাস্তার প্ল্যাকার্ড, পোস্টার, ব্যানারে বানান ভুল নিয়ে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। বাংলা একাডেমি কর্তৃক সঠিক বানানের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকলেও মানতে নারাজ অনেকেই। এজন্য ঢাকার প্রধান সড়কের পাশে ফার্মেসি ও ফটোস্ট্যাটের দোকানের প্রত্যেকটির সাইনবোর্ডে লেখা 'ফার্মেসী', 'ফটোস্ট্যাট' ইত্যাদি।

কয়েকটি দোকানে স্টোরের জায়গায় 'ষ্টোর' লিখে রাখা হয়েছে। রাস্তা সংলগ্ন বেশকিছু রেস্টুরেন্ট চোখে পড়ে যেগুলোতে লেখা 'রেষ্টুরেন্ট'। একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের নামের বানানে ভুল করে মডার্ন না লিখে 'ণ' 'মর্ডাণ' লেখা রয়েছে। অথচ আমরা জানি, কোনো বিদেশি শব্দে ণ, ষ এবং ঈ কার হবে না। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অন্যতম পুণ্যস্থান ছিল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণ। কিন্তু সেখানেও বানান ভুল দেখতে পাবেন। মেডিক্যালে ঢুকেই নজরে আসে 'বার্ন এবং সার্জারি' (বার্ন এ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট) বানান ভুল।

একটু পেছন ফিরলেই চোখে মিলবে ইমারজেন্সি কমপ্লেক্সের 'ইমারজেন্সি' ভুল বানান। অন্যদিকে সুপ্রিমকোর্টের বানান ভুল করে 'সুপ্রীম' লেখা। জাতীয় প্রেস ক্লাবের কর্মচারী ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বানানটাই 'ষ' দিয়ে লেখা।

আবার একই শব্দ একেক সাইনবোর্ড বা দেওয়ালে লেখা হচ্ছে একেক রকম। এতে একদিকে যেমন বাংলা ভাষার বিকৃতি ঘটছে তেমনি শিশুর ভাষা বিকাশে ত্রুটি ঘটছে বলে ভাষা বিশেষজ্ঞদের অভিমত। শিশুরা আগ্রহ নিয়ে সাইনবোর্ডগুলো পড়ে। আর সেখানে যদি ভুল থাকে তবে সেটি তাদের মনে গেঁথে যায়। অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত আর্টিস্ট দ্বারা যখন কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, স্কুল কিংবা বাসাবাড়ির কাজ করা হয় তখন সে সব সাইনবোর্ড, ব্যানার ও দেওয়াল লিখন বাংলা বানানে ভুলে ভরা থাকছে।

সাইনবোর্ড হচ্ছে চোখের ঝিলিক; প্রতিষ্ঠানের আয়না। প্রতিষ্ঠানের পরিচয় যদি ভুল বানানে থাকে তাহলে প্রথমেই একটা বিরূপ ধারণা চলে আসে। যেমন- ফার্নিচারের দোকানগুলোতে দেখা যায় ফার্নিচার শব্দটিই একেক দোকানে লেখা আছে একেক রকম। 'মদিনা ফার্নিসারস', 'প্যারামাইন্ট ফার্নিশার্স', 'হোম ফার্নিশার্স' বানানে লেখা হয়েছে শব্দটি। অটোমোবাইলসের সাইনবোর্ডে লেখা আছে 'এহানে মুবিল, গিরিজ, পিট্রোল' (এখানে মবিল, গ্রিজ, পেট্রোল) পাওয়া যায়। 'রহমান অটোমোবাইলসের' জায়গায় লেখা

আছে 'রয়মান অটোমোবাইল', গ্রিজকে লেখা আছে 'গিরিজ', অকটেনকে লেখা আছে 'অটেন'।

মোবাইলের দোকানের সাইনবোর্ডে দেখা যায়, 'কলিম ইন্টারপ্রাইজ'- তাতে আরো লেখা 'এখান থেকে ফিলিক্স লোড, এজি লোড করা হয়। মোবাইল টু মবেল ২ টাকা। বিকাষ করা হয়।' বাসাভাড়ার বিজ্ঞাপনেও ভুল লেখা চোখে পড়ে। যেমন- 'এখানে ঘোর ভারা দেয়া হবে। পানি, গস সুবিধাসহ।' ছাত্রাবাসগুলোর সাইনবোর্ডে লেখা আছে, 'মেছ ভাড়া দেয়া হবে।' যারা এসব বাংলা লেখে তাদের কেবল বর্ণমালা সম্পর্কে ধারণা নিয়ে কাজ করতে হয়। বানান নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। তবে যারা লিখে নিচ্ছেন তাদেরও রয়েছে বানানে অদক্ষতা। অর্থাৎ অসচেতন মানুষের কারণে বাংলা ভাষা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শহরকেন্দ্রিক তরুণ-যুব সমাজের মধ্যে সুন্দর এবং শুদ্ধ করে বাংলা বলার ক্ষেত্রেও অনীহা লক্ষণীয়। বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজি মিলিয়ে খিচুড়ি করতে ওস্তাদ ওরা। কোনোটাই ঠিক হয় না।

আসলে মাতৃভাষার মর্যাদার প্রতি তাদের যেন কোনো অঙ্গীকারই নেই। পৃথিবীর উন্নত জাতি তাদের নিজস্ব ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতির ব্যাপারে কোনো আপস করে না। কিন্তু আমাদের দেশে রক্তরঞ্জিত বাংলা বর্ণমালার অবমাননা দেখা যায় সর্বত্র। এক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়ায় বাংলা প্রয়োগে ভুলের রাজত্ব লক্ষণীয়। ভুল বানান, ভুল বাক্যের ছড়াছড়ি থাকে পোস্টের পর পোস্টে। দৃষ্টান্ত দেওয়া থেকে বিরত থাকলাম।

কেবল সোশ্যাল মিডিয়া নয়, খ্রিস্টিয় বছরের প্রথম দিনে বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া বিনামূল্যের বই নিয়ে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে ছিল তুমুল বিতর্ক। ছিল কবিতার বিকৃতি আর বানান ভুলের ছড়াছড়ি। এমনকি মুদ্রণের মান ও অলংকরণ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল তখন। প্রথম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যবইয়ে অক্ষরজ্ঞান সূচিতে পাঠ ১২- তে 'ও' অক্ষর চেনানোর উপকরণ হিসেবে 'ওড়না' কে ব্যবহার করা হয়েছিল। 'শুনি ও বলি' পাঠে 'ও' অক্ষর চেনায় ওড়না পরা এক কন্যাশিশুর ছবি দিয়ে লেখা হয়েছিল- 'ওড়না চাই'।

প্রথম শ্রেণির বাংলা বইয়ের লেখা ও ছবিতে 'ছাগল গাছে উঠে আম খাচ্ছে' বোঝাতে চেয়েছিলেন লেখক। বাংলা পাঠ্যবইটির ১১ পাতায় অ'তে অজ (ছাগল) বোঝাতে গিয়ে ছাগলের ছবি জুড়ে দেয়া হয়। সংশোধন করা না হলে ছাগলের গাছে উঠে আম খাওয়ার মতো অসম্ভব বিষয় শিখতে হতো শিশুদের। তৃতীয় শ্রেণির বাংলা বইয়ে কুসুমকুমারী দাশের 'আদর্শ ছেলে'

কবিতাটি বিকৃত করা হয়েছিল। 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে' না লিখে লেখা হয়েছিল 'আমাদের দেশে সেই ছেলে কবে হবে?' এছাড়া 'মানুষ হইতে হবে- এই তার পণ' না লিখে 'মানুষ হতেই হবে- এই তার পণ' লেখা হয়। 'হাতে প্রাণে খাট সবে শক্তি কর দান' এই লাইনে 'খাট' শব্দটির বানান বদলে দিয়ে লেখা হয়েছিল 'খাটো'।

এছাড়া চতুর্থ শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' বইয়ের ৭৮ পাতায় '১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধ' লেখায় মুক্তিযুদ্ধ শব্দটি কখনো 'মুক্তিযুদ্ধ' আবার কখনও 'মুকতিযুদ্ধ'। 'বঙ্গবন্ধু' বানানটি ভেঙে ঙ-গ আলাদা আলাদা করে লেখা হয়। যা হোক, এসব সমস্যা সমাধান করা হয়েছিল অতি দ্রুত। কিন্তু ভুলে ভরা বাংলা ভাষার দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়। আমরা মনে করি, পাঠ্যপুস্তকে কোনো ধরনের ভুল গ্রহণযোগ্য নয়। শিশুদের কাছে উপস্থাপিত কবিতা বা লেখার কোনো ভুল বা বিকৃতি ভবিষ্যতেও পরিহার করতে হবে।

আসলে বাংলা ভাষার বিকৃতি ঘটছে সর্বত্রই। এফএম রেডিওতে বাংলা ভাষাকে ইংরেজি স্টাইলে উচ্চারণ করা হচ্ছে। ভুলে ভরা বানানে প্রতিবাদলিপি প্রেরিত হয়েছে দৈনিক পত্রিকায়; কয়েক বছর আগে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নে ভুল দেখা গেছে। তখন বিজ্ঞান পরীক্ষায় ছিল ব্যাকরণগত ভুল। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের এক ফেস্টুনের ছবিতে দেখা গেছে বানান ভুলের ছড়াছড়ি। শিক্ষা, 'মেরুদণ্ড' এমন সাধারণ বানানেও ভুল হতে দেখা গেছে সেখানে। পাওয়া গেছে ভুলে ভরা উত্তরপত্র মূল্যায়ন নির্দেশিকাও।

আওয়ামী লীগ সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যে নির্দেশনা মোতাবেক অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে নিজস্ব ওয়েবসাইট। কিন্তু এসব ওয়েবসাইটে রয়েছে অনেক ভুল। ওয়েবসাইটগুলো মানছে না বাংলা একাডেমির প্রমিত 'বাংলা বানান রীতি'।

জাতীয় সংসদের নিজস্ব ওয়েবসাইটের বাংলা সংস্করণে ইংরেজি শব্দের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার দেখা গেছে। অথচ এসব শব্দের বাংলা অর্থ রয়েছে। আবার এসব শব্দের ব্যবহারের রয়েছে ভুল। ওয়েবসাইটে দেখা গেছে, ট্যাবগুলোর মধ্যে রয়েছে হোম, লাইব্রেরি। অথচ চাইলেই হোমের পরিবর্তে 'প্রচ্ছদ' আর লাইব্রেরির পরিবর্তে 'গ্রন্থাগার' শব্দটি ব্যবহার করা যেত। এসব প্রমাণ করে বাংলা শব্দ ব্যবহারে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জয়জয়কার সর্বত্র হওয়া সত্ত্বেও আমাদের ভালোবাসার বাংলা ভাষা তার স্বকীয়তা হারাচ্ছে দিন দিন। এজন্য মূলত দায়ী আমরাই।

বিশ্বে সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি ভাষা প্রচলিত আছে। তার মধ্যে অন্যতম আমাদের বাংলা ভাষা। ব্যবহারের দিক থেকে আমাদের মাতৃভাষার অবস্থান চতুর্থ। কালের বিবর্তনে আমাদের ভাষার শব্দ সম্ভার ও গদ্যরীতির দিন দিন পরিবর্তন লক্ষণীয় হলেও ভুল প্রয়োগে ভাষার মর্যাদাহানি হচ্ছে।

মূলত ভুলে ভরা বাংলা ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করার জন্য প্রথমে দরকার সচেতনতা; প্রমিত বানানরীতি অনুসরণ করা এবং ইংরেজি শব্দের গ্রহণযোগ্য বাংলা পরিভাষা ব্যবহার আবশ্যক; উপরন্তু বিদেশি শব্দের যথার্থ পরিভাষা তৈরি এবং সেগুলোর বানানরীতি স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া প্রযুক্তির প্রসারের যুগে বাংলাকে ইন্টারনেটের এক্সপ্রেসওয়েতে আরোহণ করতে হবে। এজন্য সরকারি উদ্যোগ ও জনগণের উদ্যম দুটোই জরুরি।

লেখক: বিশিষ্ট লেখক, কবি, কলামিস্ট, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রগতিশীল কলামিস্ট ফোরাম, নির্বাহী কমিটির সদস্য, সম্প্রীতি বাংলাদেশ এবং অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলা ভাষা এখন সারা বিশ্বের

নজরুল ইসলাম

লন্ডনে আমার কর্ম পরিসরে কাজ করতে গিয়ে আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দ উপভোগ করি আমার ইংলিশ কলিগ কিড হাওয়াডের (Kidd Howard) সঙ্গে। বিকেলে ফ্রি টাইমে আমরা অফিসে বসে বিভিন্ন বিষয়ে গসিপিং করি। আমার মোবাইলে ব্যক্তিগত ফোন আসলে আমি রিসিভ করে বাংলায় খুব দ্রুত কথা বলা শুরু করি। একদিন আমি কথা বলছিলাম, দেখলাম আমার কলিগ কিড হাওয়াড (Kidd Howard) চোখ বুজে বসে আছে। আমি ভাবছিলাম

সে বোধহয় বিরক্তবোধ করছে। ফোন শেষে Apologise করলাম। বললাম, আমি দুঃখিত Howard, I was bit loud, অফিসে তারা আমাকে নাজ বলে ডাকে। সে আমাকে বলল, নাজ, আমি অনেক অ্যাঞ্জয় করি প্রতিবার যখন তুমি তোমার ভাষায় কথা বলো- ইহা আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। আমি বললাম Howard আপনি কি রসিকতা করছেন? প্রত্যুত্তরে সে বলল, 'নাজ undoubtedly this is a very sweet language.' সেদিন আমি খুব গর্বিত বোধ করেছিলাম।

তাৎক্ষণিক অফিসে গুগলে বাংলা ভাষাকে নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি শুরু করলাম। চোখে পড়ল 'বাংলা বিশ্বের সবচেয়ে মিষ্টি ভাষা', এমন আনন্দ উত্তেজনাপূর্ণ খবর শুনে আমার পা মাটিতে বসছিল না। চোখে পড়লো ইউনেস্কোর এক সমীক্ষা, যেখানে বাংলা ভাষাকে বিশ্বের মধুরতম ভাষা হিসাবে ভোট দেয়া হয়েছে, স্পেনিয় এবং ডাচকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মিষ্টি মাতৃভাষা হিসাবে স্থান দেয়া হয়েছে। যদিও ইউনেস্কোর সমীক্ষা নিয়ে বিভ্রান্তি আছে। আমি এটিকে খুব গুরুত্ব সহকারে নিয়েছি। কারণ, আমি আমার মাতৃভাষা সম্পর্কে বিভ্রান্ত নই।

১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কো কর্তৃক বাংলাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি এবং ২০১০ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এখন থেকে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হবে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। আর এভাবেই বাংলা ভাষার বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া চলমান। পাঠক, এখন সারা বিশ্বের ১৯১টি দেশে একযোগে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাংলা ভাষা এখন আর বাংলা ভাষীর নয়, সারা বিশ্বের। পৃথিবীর ইতিহাসে ভাষা নিয়ে কোনো দেশে আন্দোলন সংগ্রাম হয়নি। বাংলাদেশের মানুষ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে রাজপথে আন্দোলন করেছে। রক্ত ও জীবন দিয়ে বিশ্বে স্থান করে নিয়েছে। বাংলা ভাষা এখন বিশ্ব বাঙালির সংগ্রাম ও আত্মমর্যাদার প্রতীক। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের অহংকার, শহিদ মিনার। মাতৃভাষার সুরক্ষা বিকাশ এবং অনুশীলন ছাড়া কোনো জাতি অগ্রসর হতে পারে না। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের একুশে ফেব্রুয়ারি ছিল ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব ও শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রথম প্রতিরোধ এবং জাতীয় চেতনার প্রথম উন্মেষ। সেদিন মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রাখতে গিয়ে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিল রফিক, জব্বার, সালাম, বরকত ও সফিউররা। পৃথিবীর ইতিহাসে মাতৃভাষার জন্য রাজপথে বুকের রক্ত ঢেলে দেয়ার প্রথম নজির এটি। সেদিন তাদের রক্তের বিনিময়ে শৃঙ্খলযুক্ত হয়েছিল বর্ণমালা ও মায়ের

ভাষা। যার মাধ্যমে বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল যা মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় পথ বেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। তাই একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির কাছে চির প্রেরণার প্রতীক।

একুশের প্রথম প্রহর থেকেই জাতি কৃতজ্ঞ চিত্তে ভাষা শহিদদের স্মরণ করে। হৃদয়ের সবটুকু আবেগ ঢেলে দিয়ে সবার কণ্ঠে বাজে একুশের অমর শোকসঙ্গীত-'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি'। এই দিনটি ঐতিহ্যের পরিচয়কে দৃঢ় করেছে। বাংলা ভাষার রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে সম্মানের আসন লাভ করেছে। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে এ ভাষার কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার অমর কাব্যগ্রন্থ 'গীতাঞ্জলি' রচনা করে বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এ ভাষার অসাধারণ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে বাংলাকে নিয়ে গেছেন বিশ্ব পরিমণ্ডলে।

একটু পিছু ফিরলে ও সঠিক ইতিহাস ঘাটাঘাটি করলে একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের প্রেরণা দেয়, উজ্জীবিত করে। অধ্যাপক আবুল কাশেমের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন তমদ্দুন মজলিশের হাত ধরে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিশ একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে যার শিরোনাম ছিল 'পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা-না উর্দু'? এই পুস্তিকার লেখক কাজী মোতাহার হোসেন আবুল মনসুর আহমেদ এবং অধ্যাপক আবুল কাশেম বাংলা ভাষাকে ভাব বিনিময়, অফিস আদালতের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে জোরালো দাবি তুলে ধরেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে উর্দু ও ইংরেজিকে সরকারি ভাষা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। গণপরিষদে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা হিসেবে উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন। পাকিস্তান গণপরিষদে তার প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় পূর্ব বাংলায় শুরু হয় বিক্ষোভ প্রতিবাদ। ২৭ ফেব্রুয়ারি এক সভায় গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। সভায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার দাবিতে ১১ মার্চ বৃহস্পতিবার সারা দেশে হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ১১ মার্চ তারিখটি রাষ্ট্রভাষা দিবসরূপে পালিত হয়। ২১ মার্চ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে রেসকোর্স ময়দানে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এক নাগরিক সংবর্ধনায় ঘোষণা করেন যে 'উর্দুই হবে

পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' সমাবেশস্থলে উপস্থিত ছাত্রনেতারা ও জনতা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে। ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ÔStudents Role in nation building' শিরোনামে একটি ভাষণ প্রদানকালে ক্যাটাগেরিক্যালি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবিকে নাকচ করে দিয়ে বলেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একটি এবং সেটি উর্দু, একমাত্র উর্দুই পাকিস্তানের মুসলিম পরিচয় তুলে ধরে। জিন্নাহর এই বক্তব্য সমাবর্তনস্থলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং ছাত্ররা দাঁড়িয়ে 'নো নো' বলে প্রতিবাদ করে। জিন্নাহর এই বাংলাবিরোধী স্পষ্ট অবস্থানের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন আরো বেশি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সমৃদ্ধ, বিস্তৃত। যা আলোচনা করলে শেষ হবে না। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭১ পরবর্তী বাংলা ভাষাকে সত্যিকার অর্থে বিশ্বায়নের পূর্ণরূপ দেয়ার জন্য বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার উদ্যোগের প্রথম বাস্তবায়ন হয় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে। জাতিসংঘে কার্যক্রম পরিচালিত হয় পাঁচটি ভাষায়। সব দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী তথা জাতিসংঘের নিযুক্ত প্রতিনিধিরা উক্ত পাঁচটি ভাষার যে কোনো একটি ভাষায় ভাষণ দেন। একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে বাংলায় ভাষণদান করার ফলে বিশ্ববাসী জানতে পারে বাংলা ভাষার মহত্ব। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে বিশ্বজুড়ে অমর একুশের উদযাপন নিঃসন্দেহে এক বিশাল জাতীয় গৌরব ও সম্মানের।

২০০১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মার্চ বিশ্বের সব মাতৃভাষার গবেষণা উন্নয়ন ও সংরক্ষণে কাজ করার উদ্যোগে জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুনের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ঢাকার সেগুনবাগিচায়। বর্তমানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট ভাষাসংক্রান্ত গবেষণা। ভাষা সংরক্ষণ ও প্রশিক্ষণের পাশাপাশি এটি ভাষার ক্ষেত্র আন্তর্জাতিক সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে যা বাংলা ভাষাকে বিশ্ব মর্যাদায় আসীন করতে ভূমিকা রাখছে।

শেষ করতে চাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রতিপাদ্য দিয়ে, 'শিক্ষা ও সমাজে অন্তর্ভুক্তির জন্য বহুভাষাবাদকে উৎসাহিত করা' স্বীকৃতি দেয়া যে, ভাষা এবং বহুভাষিকতা অন্তর্ভুক্তিকে এগিয়ে নিতে পারে, এবং কাউকে পেছনে না রেখে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। ইউনেস্কো বিশ্বাস করে যে, প্রথম ভাষা বা মাতৃভাষার উপর ভিত্তি করে

শিক্ষার প্রাথমিক বয়স থেকেই শৈশবকালীন যত্ন এবং শিক্ষাই শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে শুরু করা উচিত।

লেখক: ফ্রিল্যান্স জার্নালিস্ট, ওয়ার্কিং ফর ন্যাশনাল হেল্থ সার্ভিস (NHS) লন্ডন, মেম্বার, দ্য ন্যাশনাল অটিস্টিক সোসাইটি ইউনাইটেড কিংডম।

অমর একুশে ও মাতৃভাষা

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন

সময়ের বিবর্তনে প্রতি বছরই বাঙালির অস্তিত্বে ফিরে আসে অমর একুশে। আমরা আবেগাপ্লুত হই, গ্রন্থমেলার আয়োজন করি; সভা-সমাবেশ, আলোচনা, বক্তৃতা-বিবৃতি, ভাষণ, স্মৃতিচারণ আর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাবনত চিত্তে শহিদদের স্মরণ করি। ফেব্রুয়ারি মাস এলেই মাতৃভাষার প্রতি এই অকৃত্রিম দরদবোধে আমরা তাড়িত হই এবং এ মাসের নির্ধারিত কিছু কর্মসূচি সম্পন্নকরণের ভেতর দিয়েই মায়ের ভাষার প্রতি সব দায়-দায়িত্ব পালন হয়ে যায়- এমনটিও অনেকে ধরে নেন। প্রকৃত প্রস্তাবে মহান স্রষ্টার অন্যতম সেরা উপহার মায়ের ভাষা বাংলার প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধের জায়গাটি অনেকটাই বিস্তৃত, প্রসারিত। খুবই প্রথাসিদ্ধ কিছু আচার-অনুষ্ঠান উদযাপনে এ দায়িত্বের হকটুকু আদায় মাতৃভাষার মর্যাদা ইসলামে স্বীকৃত। মহানবীর

(সা.) মাতৃভাষা ছিল আরবি। বায়হাক্বি শরীফের একটি হাদিসে তার আরবিপ্রীতির বিরল নজির পাওয়া যায়। তিনি বলেন- 'তোমরা তিন কারণে আরবদের ভালোবাসবে। প্রথমত; আমি আরবিয়, দ্বিতীয়ত; পবিত্র কোরআনের ভাষা আরবি এবং তৃতীয়ত; জান্নাতবাসীদেরও ভাষা হবে আরবি। রাসুলের (সা.) উল্লিখিত বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে মাতৃভাষার প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। একইভাবে এর মাধ্যমে অপরাপর ভাষী জনগোষ্ঠীর স্ব-স্ব ভাষার গুরুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। মাতৃভাষার গুরুত্ব আমাদের কাছে আরও বেড়ে যায় যখন দেখি মহান আল্লাহতায়ালা বলেছেন- 'আমি প্রত্যেক রাসুলকে তার জাতির মাতৃভাষাতেই প্রেরণ করেছি, যাতে তিনি আল্লাহপাকের বাণী সহজেই তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারেন।' (১৪ :৪)। মহান আল্লাহ ও তার প্রিয় রাসুলের (সা.) বাণীর মাধ্যমে মাতৃভাষার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া যায়।

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ছয় সহস্রাধিক ভাষার মধ্যে এক এক জনপদের লোকেরা তাদের সেই প্রিয় মাতৃভাষায় কথা বলে থাকে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহর বাণী- 'আমার নিদর্শনগুলোর মাঝে রয়েছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি এবং ভাষা ও বর্ণের মধ্যে পার্থক্য; জ্ঞানীদের জন্য এতে সুনিশ্চিত অনেক নিদর্শন রয়েছে (৩০ : ২২)।' পৃথিবীর অপরাপর জিনিসের মতো মাতৃভাষার স্রষ্টাও স্বয়ং মহামহিম আল্লাহ। তিনি বলেন- 'তিনিই মানব সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে মনের ভাব-বর্ণনা (ভাষা) প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন (৫৫ :৩-৪)।'

মানব সমাজে অমানিশার ঘোর তমসাচ্ছন্নতার অবসান আর অজ্ঞতা-মূর্খতার অন্ধকার দূরীকরণে মহান আল্লাহ সময়ের ব্যবধানে তার নির্বাচিত প্রিয় পাত্রদের প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা ও মর্যাদা দিয়ে প্রেরণ করেছেন। মানুষ ও মানবতার সব অপ্রাপ্তি পরিপূরণ ও পার্থিব-অপার্থিব সার্বিক সফলতা অর্জনের মানসে নাজিলকৃত সব আসমানি গ্রন্থ স্ব-স্ব পয়গম্বরের মাতৃভাষাতেই প্রচারিত হয়েছে। হজরত আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহপাক প্রত্যেক নবীকে তার স্বজাতির ভাষায় প্রেরণ করেছেন (আহমদ)।' আল্লাহর বাণীবাহক হজরত মুসার (আ.) মাতৃভাষা ছিল ইবরানি। তাই এ ভাষাতেই মহান আল্লাহ তাওরাত কিতাব নাজিল করেছেন। একইভাবে হজরত দাউদের (আ.) মাতৃভাষা ইউনানিতে জাবুর কিতাব, হজরত ঈসার (আ.) মাতৃভাষা সুরিয়ানিতে ইঞ্জিল কিতাব আর সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর হজরত মুহাম্মদের (সা.) মাতৃভাষা আরবিতে মহাগ্রন্থ আল কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহপাক বলেন- 'এই কোরআন বিশ্ব-জাহানের

পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ। বিশ্বস্ত ফেরেশতা জিব্রাইল একে নিয়ে অবতরণ করেছে। আপনার অন্তরে, যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শনকারী হতে পারেন। আর এ মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়। নিশ্চয় এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাবগুলোয় (২৬ :১৯২-১৯৬)।' মহানবী (সা.) মাতৃভাষাতেই পবিত্র কোরআনের বাণী প্রচার করেছেন। মাতৃভাষার গুরুত্ব তাই অপরিসীম।

আল কোরআনে রয়েছে- 'হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি; যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও (৪৯:১৩)।' পৃথিবীর নানান জাতির বসবাস এবং তাদের মনোভাব প্রকাশের জন্য মাতৃভাষাও রয়েছে। সেই মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার রক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে তুরস্ক, বুলগেরিয়া, মধ্য এশিয়ার অঞ্চল আর ভারতের উত্তরপ্রদেশসহ বিশ্বের কিছু জাতিগোষ্ঠীকে। কিন্তু বাঙালি জাতি শুধু আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলার মানুষকে জীবনও দিতে হয়েছে। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ৮ ফাল্গুন মোতাবেক ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালির ইতিহাসে রচিত হয়েছে অমর এক শোকগাঁথা; যেখানে শাহাদতের সুধা পান করতে হয়েছে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেককেই। বাংলার দামাল ছেলেরা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে মায়ের ভাষাকে মুক্ত করেছে, যা ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্যকে আরও গভীরে নিয়ে গেছে। সেই দায়বদ্ধতা থেকেই আমাদের উচিত বিশুদ্ধ মাতৃভাষার চর্চা করা; ভাষা বিকৃতি থেকে রক্ষা করা।

মহান ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক ধারণা থেকে আমরা বলতে পারি, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের বাংলা ভাষার এই আন্দোলনের প্রধানত উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষা বাংলার অবাধ ব্যবহার ও তার সার্বিক উৎকর্ষ বিধান এবং সর্বস্তরে চর্চার অধিকার আদায় করা। অপর উদ্দেশ্যটি ছিল মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে সরকারি-বেসরকারি অফিস-আদালতসহ রাষ্ট্রীয় সব প্রতিষ্ঠানে এর যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত এবং জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা ও সারাবিশ্বে এ ভাষার পরিচিতি আরও উন্নত পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়া। সে জন্যই আমাদের ভাষা আন্দোলনের মূল স্লোগান ছিল- 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। ভাষা আন্দোলনের আরেকটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জাতি হিসেবে বাঙালির সব গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার। কেননা, সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির মুখের ভাষার পরিবর্তে সংখ্যালঘিষ্ঠ কোনো জাতির ভাষা এখানে চাপিয়ে দেওয়া কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না; বরং তা সভ্যতা ও

মূল্যবোধের চরম পরিপন্থি। এ রকম একটি অগণতান্ত্রিক, অন্যায় ও মানবাধিকার পরিপন্থি বিষয়ের তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে গিয়েই মহান ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল, যা পরে বাঙালি জাতির জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সব বৈষম্য দূরীকরণে পর্যায়ক্রমে এক ঐতিহাসিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এ ক্ষেত্রে অমর একুশের অকুতোভয় বীর শহিদদের অবদান চিরস্মরণীয়।

মহানবী (সা.) ছিলেন আরবের সবচেয়ে সুন্দর ও শুদ্ধভাষী। তিনি কোনোদিন একটি অশুদ্ধ বা বিকৃত শব্দ বা বাক্যও উচ্চারণ করেননি। আমাদের মাতৃভাষা বাংলার প্রতি শহিদদের অবদান এবং মহানবীর (সা.) মাতৃভাষাপ্রীতির অজস্র নজির সামনে রেখে এ বিষয়ে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। ইতিহাসের আলোকে আমরা দেখতে পাই, আরবের অধিবাসীদের নীতিবিধান, জীবনবোধ ও সামগ্রিক আচার-পদ্ধতি সহজে বোঝানোর জন্যই আরবি ভাষাতে কোরআন নাজিল হয়েছিল। আর তা আল্লাহপাকের এক বাণীতেও পরিষ্কার অনুধাবন করা যায়- ‘আমি একে আরবি ভাষায় কোরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা সহজে বুঝতে পার’ (১২:২)। ‘মহান আল্লাহর এ নির্দেশনার আলোকে আমাদেরও উচিত সর্বস্তরে মাতৃভাষা বাংলার যথার্থ প্রচলন এবং বাংলা ভাষার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি আনয়ন। বাংলা ভাষার কবি, লেখক, গবেষক, সাংবাদিক, প্রতিবেদকসহ সংশ্লিষ্ট সবার উচিত তাদের রচনায় আমাদের শিশু-কিশোরসহ অল্পশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মানুষের সহজে বোধগম্য হয় এমন শব্দাবলির ব্যবহার করা। ভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি সহজবোধ্য ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে উপস্থাপন বাঞ্ছনীয়। ধর্মীয়, নৈতিক ও শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধীয় সব রচনা মাতৃভাষায় অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন, যাতে ইসলামকে বুঝতে সহজ হয়, নৈতিক জ্ঞানে মানুষ গুণান্বিত হয় এবং বিদেশি রচনাবলির স্বাদ বাংলায় আস্বাদন করতে সক্ষম হয়।

লেখক ও গবেষক; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

একুশের চেতনা ও ভাষাপ্রেম

সালাম সালেহ উদদীন

একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। অনেক ত্যাগ ও সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা মাতৃভাষা আন্দোলনে বিজয় অর্জন করেছি, হয়েছি নবচেতনায় উজ্জীবিত। সঙ্গত কারণেই একুশ আমাদের প্রতিবাদী সংগ্রামী হতে শিক্ষা দেয়। কেবল ভাষার মাস এলেই আমরা একুশের কাছে, একুশের চেতনার কাছে ফিরে যাই। এই চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করি। সারা বছর একুশ নিয়ে আমাদের কোনো ভাবনা ও মনোযোগ থাকে না। আমরা সচেতনভাবে নয়, অবচেতনভাবেই আমাদের আত্মপরিচয়ের ভিত্তিভূমি একুশকে অবহেলার চোখে দেখে আসছি। এই ধরনের প্রবণতা আত্মঘাতী। বাংলা ভাষার বিকাশ ও চর্চার জন্য, সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের প্রচেষ্টা সারা বছর থাকতে হবে। যে ভাষার জন্য এত ত্যাগ ও সংগ্রাম সে ভাষা উপেক্ষিত

হতে পারে না, বন্দি হতে পারে না কোনো দুষ্টচক্রের হাতে। সাংস্কৃতিক চেতনা দিয়েও যে সংগ্রাম করা যায় বাঙালির ভাষা আন্দোলন তার বড় প্রমাণ। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে বাঙালি সংগ্রামের সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। ভাষা শহিদদের দেশপ্রেম ও ভাষাপ্রেমের ইতিহাস আজও আমাদের আত্মচেতনাকে জাগ্রত করে ভাষা সংস্কৃতি, কৃষ্টির উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্য রক্ষায় সংকল্পবদ্ধ করে তোলে। একুশের যে চেতনা এ দেশের মানুষকে আত্মপরিচয়ের পথ দেখিয়েছে, সে চেতনায় সমগ্র বাঙালিসত্তা উপলব্ধি করে আমি বাঙালি, বাংলা আমার মাতৃভাষা, আমি মায়ের ভাষায় কথা বলি।

আশার কথা, ভাষা শহিদ দিবসসহ বিভিন্ন দিবসের উদযাপনে বাংলা সন ও তারিখ ব্যবহারে নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছে হাইকোর্ট। এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের বেঞ্চ এ রুল দেয়। এক সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে বলে আবেদনকারীর পক্ষের আইনজীবী মো. মনিরুজ্জামান লিংকন জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ১২ ফেব্রুয়ারি চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদার নস্কর আলী সরকারি-বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান- সংস্থায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা বা শহিদ দিবসসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবসের অনুষ্ঠান পালন, উদযাপনে বাংলা সন ও তারিখ ব্যবহার বা উল্লেখের নির্দেশনা চেয়ে রিট আবেদনটি করা হয়। জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবস পালন বা উদযাপনে ইংরেজি তারিখের উল্লেখ থাকলেও বাংলা সন, তারিখের কোনো উল্লেখ থাকে না। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, ভাষা শহিদ দিবসের তারিখটাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইংরেজি তারিখে। ঘটনার দিনটি যে ৮ ফাল্গুন ছিল, ব্যবহার না করায় তা অনেকেই জানেই না। সরকার বাংলা পঞ্জিকা পরিবর্তনের পর এখন থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি ৮ ফাল্গুন পড়ার কথা। কিন্তু কেউ তো বাংলা সন-তারিখটা ব্যবহার করছে না। তাই বাংলা সন-তারিখ ব্যবহারের নির্দেশনা চেয়ে আবেদনটা করা হয়েছিল। এই আবেদনটি অত্যন্ত সময়োপযোগী। সারাদেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের যে অনুষ্ঠান হয়, তাতে যে সাইনবোর্ড থাকে, সেখানে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা তারিখও লেখা উচিত। এই চর্চা এতদিন কেন করা হয়নি সেটাই বড় প্রশ্ন।

অপ্রিয় হলেও সত্য, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের যে দাবি ছিল তা আজও পূরণ হয়নি। শুধু কাগজে-কলমে রাষ্ট্রভাষা বাংলা। কিন্তু সর্বত্রই

ইংরেজিসহ বিদেশি ভাষার দাপট ও আগ্রাসন। ভাষা শহিদদের চাওয়া এখনো পূরণ হয়নি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সর্বস্তরে বাংলার ব্যবহার নিশ্চিত করতে উদ্যোগ নেয়া হয়। বিভিন্ন সরকারের আমলে আইনও প্রণয়ন করা হয়। আইনের প্রয়োগ না থাকা অথবা মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞার কারণে দেশের বেশিরভাগ স্তরেই বাংলা বিমুখতা প্রকট আকার ধারণ করে। সর্বস্তরে বাংলার ব্যবহার নিশ্চিত করতে উচ্চ আদালতের নির্দেশনাও রয়েছে। এত কিছুর পরও সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়নি। এভাবে চলতে থাকলে রাষ্ট্রভাষা বাংলা একদিন অস্তিত্ব সংকটে পড়বে। তাই মাতৃভাষার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করতে হবে সবাইকে। অবিলম্বে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন ভাষাবিদরা। বাংলা বিশ্বের ২২ কোটি মানুষের মাতৃভাষা, বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা তথা সরকারি ভাষা। যে কোনো ভাষাই সচল প্রবহমান নদীর মতো। চর্চা ও গবেষণার মাধ্যমেই ভাষা সমৃদ্ধশালী হয়। পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয় নতুন আঙ্গিক ও অবয়বে। হাজার বছরের বাংলা অনেক সমৃদ্ধ ভাষা। এর শব্দভান্ডার অফুরন্ত। এর রয়েছে নানা বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য ও মাধুর্য। অথচ বাংলা ভাষার ঐতিহ্য হারিয়ে আমরা জগাখিচুড়ির মতো অবস্থায় উপনীত হয়েছি। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের দাপটে শিক্ষার মাধ্যম বাংলা এখন দিশাহারা। এই ধরনের পরিস্থিতি সত্যিই দুঃখজনক। যে করেই হোক এমন নাজুক অবস্থার উত্তোরণ ঘটাতে হবে। বাংলা থাকবে ইংরেজিও থাকবে, তবে বাংলাকে অমর্যাদা উপেক্ষা করে যে কোনো উদ্যোগ গ্রহণযোগ্য নয়।

বাংলা ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণ, সঠিক ব্যবহার ও প্রয়োগ এবং সঠিক বানান রীতির ওপর বাঙালি হিসেবে সব বাঙালিকে অপরিহার্যভাবে যত্নবান হতে হবে। শতভাগ মনোযোগ দিতে হবে মাতৃভাষার প্রতি। উন্নত অনেক দেশই নিজস্ব ভাষাকে গুরুত্ব দিচ্ছে। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড নিজস্ব ভাষাতেই হচ্ছে। চিন, জাপান, ফ্রান্স, জার্মান, ল্যাটিন, আমেরিকার দেশসমূহ- এমন অনেক দেশেরই নাম নেয়া যেতে পারে।

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহার নিশ্চিত করার আগে জরুরি হলো আমরা শুদ্ধভাবে বাংলা বলতে এবং লিখতে পারি কিনা তা যাচাই করা। যারা বাংলায় লেখালেখি করেন তারা অবগত আছেন ভাষা আন্দোলন, বাংলা একাডেমি আর একুশের বইমেলা মূলত একই সূত্রে গাঁথা। একুশে ফেব্রুয়ারির এই যে বইমেলা, এ শুধুই বইমেলা নয়, একুশের চেতনায় ভাস্বর বাঙালির আন্দোলনের প্রতিবাদের প্রতীক। তাই এ মেলার সঙ্গে মিশে আছে একুশের চেতনা একুশের আদর্শ, নিহিত রয়েছে বাঙালি সংস্কৃতির উৎসমূল। সঙ্গত

কারণেই সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালুসহ ভাষার বিকৃতি রোধ করতে হবে। রক্ত দিয়ে কেনা আমাদের এই ভাষা আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এরপরও আমরা কেন এই ভাষার সম্মান আর মর্যাদা রাখতে পারছি না।

আমাদের ছেলেমেয়েরা বাংলিশ ভাষায় কথা বলছে। তারা বাংলাভাষার প্রতি উদাসীন। রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ভুল বানানে বাংলা লেখা সাইনবোর্ড চোখে পড়ে, ইংরেজি সাইনবোর্ডেরও সর্বত্র ছড়াছড়ি। এটা মেনে নেয়া যায় না। ভাষাপ্রেমের আরেক প্রাপ্তি অমর একুশের গ্রন্থমেলা। মেলায় এখন পাঠকদের চেয়ে লেখকের সংখ্যা বেশি। যার কারণে অনেক নিম্নমানের বই বাজার দখল করে আছে। তবে লেখার মান নিশ্চিত করতে না পারলে বাংলাভাষা তার মর্যাদা হারাবে। ভাষাপ্রেম তথা মাতৃভাষার প্রতি দরদ ও ভালোবাসাই কেবল পারে জাতি হিসেবে আমাদের আরো সমৃদ্ধ, উন্নত ও বিকশিত করতে।

কবি, কথাসাহিত্যিক, সাংবাদিক ও কলাম লেখক

একুশের সাহিত্য

মাহবুবুল হক

অমর একুশে আমাদের জীবনে অনির্বাণ একটি চেতনা। এই চেতনায় ১৯৫২ থেকে আমাদের সংগ্রামী পথচলা। একুশ বাঙালির জাতিসত্তার জাগরণের প্রথম প্রণোদনা। একুশের চেতনা ১৯৭১-এ পরিণত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়। তারই অসামান্য ফসল আমাদের গৌরবময় স্বাধীনতা। এ আমাদের ঐতিহাসিক অর্জন।

একুশ কেবল আমাদের মুখের ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেনি, দিয়েছে দেশপ্রেমের মহান আবেগ, দিয়েছে অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী জীবনবোধ, দিয়েছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়ে চলার প্রাণশক্তি।

আমাদের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশে একুশে ফেব্রুয়ারি যেন হাজার তারের এক বীণা। তাতে সৃষ্টি হয়েছে অনেক সুর, অনেক ঝংকার! একুশের বীণায় ঝংকৃত হয়েছে আমাদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিচিত্র সুর।

একুশের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে একুশের সংকলনগুলোর রয়েছে অনন্য ভূমিকা। এরই প্রথম মাইলফলক হাসান হাফিজুর রহমান-সম্পাদিত একুশের প্রথম সংকলন একুশে ফেব্রুয়ারি। এটি প্রকাশিত হয়েছিল একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনার পরের বছর ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে। সংকলনটিতে প্রকাশিত হয় একুশের কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, গান ইত্যাদি। একুশে ফেব্রুয়ারি সংকলনের সূচিপত্র দেখলে এতে সংকলিত সাহিত্যের বৈচিত্রময় প্রকৃতি ও প্রতিবাদী বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

এই ঐতিহাসিক ও চিরভাস্বর সংকলনটি আমাদের জাতীয় সচেতনতার উদ্বোধনের প্রথম সাহিত্যিক দলিল। এর মাধ্যমে একুশের সংকলন প্রকাশের গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিল। সংকলনটি প্রকাশের পর থেকে প্রতি বছর একুশে উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে কত না সংকলন, কত না সাময়িকী। ১৯৯১-এর ডিসেম্বরে আমিরুল মোমেনীনের সম্পাদনায় যে একুশের সংকলন গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশিত হয়েছে তাতে ২ হাজার ২৮২টি সংকলনের উল্লেখ আছে। এর বাইরেও অনেক সংকলন থেকে থাকবে। এরপরেও প্রকাশিত হয়েছে প্রচুর। তাছাড়া একুশে উপলক্ষে প্রতি বছর প্রকাশিত হয়েছে পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা। আমাদের সাহিত্য-সৃষ্টির ইতিহাসে এসব সংকলন ও বিশেষ সংখ্যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও ভূমিকা রয়েছে। শোক ও বেদনার একুশ যে জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে, সৃজনের প্রেরণা হয়েছে, তার পেছনেও রয়েছে এসব সংকলন ও একুশের সংখ্যার অসামান্য অবদান।

একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের সাহিত্যাঙ্গনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে। বর্তমান প্রবন্ধে তারই সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচার এ-প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়।

দুই

একুশের প্রেরণার প্রথম সাহিত্যপ্রসূন একটি কবিতা। তা লেখা হয়েছিল চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামের সর্বদলীয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক এবং সীমান্ত পত্রিকার সম্পাদক মাহবুল উল আলম চৌধুরী। একুশের ঘটনার কথা শুনে সেদিনই লিখেছিলেন সেই কবিতাটি : ‘কাঁদতে আসিনি ফাঁসীর দাবী নিয়ে এসেছি’। কবিতাটি সে-রাতেই চট্টগ্রামের কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেসে গোপনে ছাপানো হয় এবং পরদিন লালদিঘি মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় পঠিত ও বিলি হয়। প্রকাশের পরপরই মুসলিম লীগ সরকার কবিতাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। একুশের ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া যে কতটা বেদনার, কতটা যন্ত্রণার, কতটা ক্ষোভের, কতটা নিন্দার তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল এই প্রতিবাদী

কবিতাটিতে। এ-কবিতায় প্রতিশোধের আগুনের উত্তাপ নিয়ে উচ্চারিত হয়েছিল সর্বস্তরের বাঙালির দাবি :

জালিমের গুলিতে যারা প্রাণ দিল
সেই সব মৃতদের নামে
আমি ফাঁসী দাবী করছি।
যারা আমার মাতৃভাষাকে নির্বাসন দিতে চেয়েছে তাদের জন্যে
আমি ফাঁসী দাবী করছি
যাদের আদেশে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তাদের জন্যে
ফাঁসী দাবী করছি যারা এই মৃতদেহের উপর দিয়ে
ক্ষমতার আসনে আরোহণ করেছে
সেই বিশ্বাসঘাতকদের জন্যে।
আমি তাদের বিচার দেখতে চাই।

এরপর বিগত ছয়টি দশক ধরে অসংখ্য সৃষ্টিতে ভরে গেছে একুশের সাহিত্যের ডালি।

একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে লেখা প্রথম একটি গান হচ্ছে : ‘ভুলব না ভুলব না এই একুশে ফেব্রুয়ারি।’ রচনা করেছিলেন ভাষাসংগ্রামী গাজীউল হক। একুশের অন্যতম ফসল আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর লেখা অসাধারণ গান : ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি?’ এ-গান আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশে উজ্জীবনীমন্ত্রের মতো প্রেরণাময়। এ-গান আজ আমাদের কাছে এক প্রতীকী তাৎপর্যে উজ্জ্বল। একুশ পালন, শহিদ স্মরণে, প্রভাতফেরিতে, শহিদ মিনারে এ-গান আমাদের চেতনার এক দীপ্র মশাল। এই মশালের আলোতেই পরবর্তীকালে আমরা পেয়েছি আরো অনেক দেশাত্মবোধক গান, অসংখ্য গণসঙ্গীত।

একুশের ঘটনা বাংলা কবিতায় কী ধরনের পরিবর্তন এনেছিল তা বোঝা যাবে একুশের আগে ও পরে প্রকাশিত দুটি সংকলনের কবিতা তুলনা করলে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত নতুন কবিতা সংকলনের কবিতাগুলো ছিল স্বপ্নিল মাধুর্য ও স্নিগ্ধ প্রশান্তিতে ভরা। আর ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত একুশে ফেব্রুয়ারি সংকলনের কবিতা হয়ে উঠেছিল শোকাবহ বেদনা ও ক্ষুব্ধ অঙ্গীকারে উচ্চকিত ও দৃপ্ত। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত নতুন কবিতা সংকলনে শামসুর রাহমান লিখেছিলেন :

চাঁদ ফুল পাখি মেঘ নক্ষত্র শিশির
আর নারীর প্রণয়
আজো মিথ্যা নয়।

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হাসান হাফিজুর রহমান-সম্পাদিত একুশে ফেব্রুয়ারি সংকলনে তিনি লেখেন :

আর যেন না দেখি কার্তিকের চাঁদ
কিংবা পৃথিবীর কোনো হীরার সকাল
কোনোদিন আর যেন আমার চোখের কিনারে
আকাশের প্রতিভা সন্ধ্যানদীর অভিজ্ঞান
আর রাত্রির রহস্যের গাঢ় ভাষা কেঁপে না ওঠে।

সৌন্দর্য-সমর্পিত কবিকণ্ঠে এভাবে প্রভাব পড়েছিল বেদনা, ক্ষোভ ও যন্ত্রণার। এভাবেই একুশের চেতনা বাংলা কবিতার অঙ্গনে জন্ম দিয়েছিল সমাজ-সচেতন, দায়বদ্ধ অনেক নতুন কবির, যাঁরা নারী ও নিসর্গকে নিয়ে রোমান্টিক ভাবালুতায় নিমগ্ন হওয়ার পথ থেকে সরে এলেন। তাঁরা তাঁদের কবিতায় লিখলেন রক্ত আর অশ্রুর কথা, শোষণ ও বঞ্চনার কথা। ভাবিত হলেন সমাজ ও মানুষ, স্বদেশ ও বিশ্বকে নিয়ে, স্বপ্ন দেখলেন মানব-মুক্তির। তাঁদের কবিতায় ফুটে উঠল স্বদেশের রক্তাক্ত ছবি। কবিতা তাঁদের হাতে হয়ে উঠল সংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ার।

হাসান হাফিজুর রহমান-সম্পাদিত একুশে ফেব্রুয়ারি সংকলনে একুশের কবিতা শিরোনামে সংকলিত হয়েছিল একগুচ্ছ কবিতা। তাতে শামসুর রাহমান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আবদুল গণি হাজারী, ফজলে লোহানী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আনিস চৌধুরী, আবুজাফর ওবায়দুল্লাহ, জামালুদ্দিন, আতাউর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক, হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতা সংকলিত হয়। সেসব কবিতায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল মাতৃভাষার জন্যে আবেগময় আকুলতা, শহিদদের জন্যে গভীর বেদনা, হিংস্র শাসকদের বিরুদ্ধে ক্রোধের আগুন। একুশের শোকাবহ ঘটনা কীভাবে দেশের সাধারণ মানুষকে বেদনা-বিহবল করেছিল তার আভাস পাওয়া যায় ফজলে লোহানীর কবিতায় :

মৃত্যুকে যারা ভয় করেনি,
মৃত্যু তাদের বরণ করেছে,
এ খবর গিয়ে গাঁয়ে পৌঁছেছে
সবার মুখেই বজ্রশপথ :
হাতুড়ি আমরা নামিয়ে নিলাম
কাস্তে-কোদাল থামিয়ে দিলাম
কাঁচা শহীদের স্মৃতির ভারে।

একুশের মহান শহিদদের স্মৃতিতে ছাত্রজনতা বায়ান্নর ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে তাৎক্ষণিকভাবে যে শহিদ মিনার গড়ে তুলেছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তা গুঁড়িয়ে দিয়েছিল রাতের আঁধারে। কিন্তু ইটের মিনার ভাঙতে পারলেও বাঙালির হৃদয় জুড়ে গড়ে-ওঠা মিনার যে ভাঙা যাবে না, সে-কথাই দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতায়। বাঙালির রক্ত ও অশ্রুমথিত আত্মদানের প্রতীক শহিদ মিনারকে তিনি অভিষিক্ত করেছেন হৃদয়-মহিমায় :

স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার ভয় কি বন্ধু আমরা এখনো
চার কোটি পরিবার
খাড়া রয়েছি তো।
ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক। ভয় কি বন্ধু, দেখ একবার আমরা জাগরী
চার কোটি পরিবার।

হাসান হাফিজুর রহমান অনুভব করেছেন, ভাষার জন্যে আত্মদানের ভেতর দিয়ে সালাম, বরকত, রফিক, জববার দেশের মানুষের ভেতরে সজীব হয়ে উঠছে নতুন প্রাণের দীপ্তি নিয়ে :

কি আশ্চর্য প্রাণ ছড়িয়েছে একটি দিন আগেও বুঝতে পারি নি,
কি আশ্চর্য দীপ্তিতে তোমার কোটি সন্তানের প্রবাহে-প্রবাহে
সংক্রমিত হয়েছে
একটি দিন আগেও তো বুঝতে পারি নি দেশ আমার।
শহিদের আত্মাহুতি বাঙালির জীবনে সঞ্চারিত করেছে এক অদম্য শক্তি
তাদের একজন আজ নেই;
না, তারা পঞ্চাশজন আজ নেই।
আর আমরা সেই অমর শহিদদের জন্যে,
তাঁদের প্রিয় মুখের ভাষা বাংলার জন্যে একচাপ পাথরের মতো
এক হয়ে গেছি
হিমালয়ের মতো অভেদ্য বিশাল হয়ে গেছি।

সিকান্দার আবু জাফর তাঁর তিমিরান্তিক (১৯৬৫) কাব্যগ্রন্থের 'একুশে ফেব্রুয়ারি' কবিতায় (রচনাকাল ১৯৫৪) যুগ-যুগান্তের ইতিহাস পরিক্রমায় যেসব অবিনশ্বর স্মৃতিস্তম্ভ দেখেছেন তারই ধারাবাহিকতায় অমর স্মৃতিস্তম্ভ হিসেবে দেখেছেন একুশের শহিদ মিনারকে :

আমার কালে
ইতিহাসের সর্বশেষ পথের বাঁকে
এসে দেখলাম :

অকস্মাৎ জমাট বেঁধে যাওয়া
পুঞ্জীভূত প্রতিবাদে তৈরি
আর একটি স্মৃতিস্তম্ভ।
চতুর্দিকে তার
জমাট রক্তের পুরু আচ্ছাদন।
পরিচয়হীন ফলকে লিপিবদ্ধ :
'২১শে ফেব্রুয়ারি।'

পাকিস্তানি আজাদিকে যারা 'জিন্দেগানির দূত' হিসেবে দেখেছেন সেই পাকিস্তানের যাত্রাপথকে 'নমরুদের পথ' হিসেবে চিত্রিত করে পাকিস্তানবাদের বিরোধিতা করে কবিতা লেখার সূচনা করেছিলেন আবদুল গণি হাজারী (১৯২১-৭৬)। নমরুদের সেই পথ থেকে উত্তরণের প্রেরণা হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছেন একুশের চেতনাকে। তাঁর সামান্য ধন (১৯৫৯) কাব্যগ্রন্থের 'ভালোবাসি বলেই' কবিতার অংশবিশেষ এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

অনেক মৃত্যুকে বুকে করে আমাদের বেঁচে থাকা
অনেক ঝড়ের পীড়ন পাঁজরার তলে
বরকতের মায়ের কান্না
কতবার পৃথিবীর বুক চিরে
কতবার নিস্তব্ধ হলো।
এত মৃত্যুর কথা স্মরণ করেই
আমাদের আয়ু মৃত্যুহীন
আর তোমায় ভালোবাসি বলেই
জীবন আমার
এত সহজে প্রাণ দিয়ে যাই।

ঐতিহ্য-অন্বেষী কবি হাসান হাফিজুর রহমানের 'অমর একুশে' কবিতায় স্বদেশভূমি মাতৃচেতনার নতুন মাত্রায় উদ্ভাসিত :

বস্তিবাসিনী মা অকস্মাৎ স্বাস্থ্যবান সন্তানকে বুকের কাছে
ধরতে পারলে যেমন করে আহত দিনের অসংখ্য মৃত্যুকে ভুলে থাকতে পারে
তেমনি পঞ্চাশটি শহিদ ভাইয়ের অকাল মৃত্যুকে ভুলেছি
মা, তোমাকে পেয়েছি বলে।
আজ তো জানতে এতটুকু বাকি নেই মাগো,
তুমি কি চাও, তুমি কি চাও, তুমি কি চাও
('অমর একুশে', বিমুখ প্রান্তর)

একুশের রক্তাক্ত দিনটি বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের কবিতা রচনার প্রেরণা হয়ে আছে। একুশের চেতনা অভিব্যক্তি পায় তাঁর কবিতায় এভাবে :

বাতাসের সোহাগে রাত এলো বুনো,
কারা জানি ছাত্রাবাসে মারা গেছে, 'শোনো
শোনো', তারপর গলি, ঘর, হ্যারিকেন আলো
মুহূর্তের মতো চুলে হাত বুলালো,
বই মেলে থেমে গিয়ে হৃদয়ের আওয়াজে,
আর্তিতে হাড়-ভরা ছায়া কাঁপে লাজে
চুন ওঠা দেওয়ালে,
মনে মনে বলে, 'বরকতের চোখে বুঝি ভবিষ্যৎ বুঁজে আছে।'

এভাবে একুশের চেতনা তাঁর কবিতায় ভবিষ্যৎমুখী সম্প্রসারণ পায়।
দিলওয়ারের কবিতায়ও একুশের চেতনা অনির্বাণ :

নদী ও বৃষ্টির জলে যে-দেশে শস্যেরা অফুরান
দ্বৈমাতৃক সেই দেশে সাহসী একুশে অফুরান।

তাঁর কবিতায় একুশে হয়ে উঠেছে মায়ের প্রতীক :

মা আমার বসে আছে রাত্রির নদীর তীরে একা
আমি যাবো তার কাছে। কে তুমি কঠিন বাহু মেলে
আমাকে ঠেকিয়ে রাখো।
(রাত্রির নদীর তীরে মা আমার)

একুশের চেতনার অন্যতম প্রধান আশ্রয় বাংলা ভাষা। কিন্তু বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করে এই ভাষার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র দেখে ক্ষুব্ধ কবি শামসুর রাহমান পরবর্তীকালে লিখেছেন অসাধারণ কবিতা : 'আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' :

তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো, কী থাকে আমার?
উনিশ শো বায়ান্নর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি
বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহীয়সী।
সে-ফুলের একটি পাপড়ি ছিন্ন হলে
আমার সত্তার দিকে
কত নোংরা হাতের হিংস্রতা ধেয়ে আসে।
তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো,
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা।

কিন্তু তাঁর 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় নতুনভাবে উদ্ভাসিত হয় একুশের চেতনা :

আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে
কেমন নিবিড় হয়ে। কখনো মিছিলে কখনো বা

একা হেঁটে যেতে যেতে মনে হয় ফুল নয়, ওরা
শহিদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর।
একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রঙ।
সে-চেতনা ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের দৃপ্ত আবেগময়তায় ভাস্বর :
আবার সালাম নামে রাজপথে শূন্যে তোলে ফ্ল্যাগ
বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে।
সালামের বুকে আজ উন্মথিত মেঘনা
সালামের চোখ আজ আলোকিত ঢাকা
সালামের মুখ আজ তরুণ, শ্যামল পূর্ব বাংলা।

এভাবে ভাষা-আন্দোলনের রক্ত আর অশ্রু-ঝরা সংগ্রামী ইতিহাস একাত্তরের সংগ্রামী ইতিহাসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। যেমন, সৈয়দ শামসুল হকের কবিতা 'আর কত রক্তের দরকার হবে'র কয়েকটি পঙক্তি :

মা
তুই এবার নিজেই তবে বলে দে
এই একটি শব্দ।
উচ্চারিত এই একটি শব্দ লিখতে কতখানি রক্তের দরকার হয়?
আমার এ দেহের আর কতটুকু রক্তের দরকার হবে?
যখন এ শব্দ আর এই বড় রক্তাক্ত স্বদেশ
কেউ মুছে ফেলতে পারবে না।

মা;
বরকত লিখেছে মা
সালাম লিখেছে মা
জববার লিখেছে মা
মতিউর-আসাদ ওরা লক্ষ লক্ষ লিখে গেছে মা।

এ-প্রসঙ্গে একুশের কবিতার আরেকটি বিশিষ্ট সংকলনের কথা উল্লেখ করতে হয়। এটি হচ্ছে বাংলা একাডেমি-প্রকাশিত একুশের কবিতা। একাডেমি ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রকাশ করে। ১৯৫৩ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত একুশ নিয়ে লেখা ১১৫ জন কবির ১৩২টি কবিতা এতে সংকলিত হয়। সংকলিত কবিতাগুলো বাংলা ও ইংরেজি এই দুই ভাষায় প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলোর মধ্যে রয়েছে : জসীমউদ্দীনের 'একুশের গান', সুফিয়া কামালের 'এমন আশ্চর্য দিন', আহসান হাবীবের 'একুশে ফেব্রুয়ারি', ফররুখ আহমদের 'ভাষা আন্দোলনের নিহত আত্মার প্রতি', সিকান্দার আবু জাফরের 'একুশে ফেব্রুয়ারি', আবদুল গণি হাজারীর 'একুশে ফেব্রুয়ারি', আবুল হোসেনের

'তোমাকে নিয়ে যত খেলা', সানাউল হকের 'অমর একুশে', আবদুল লতিফের 'একুশের গান', শামসুর রাহমানের 'বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', আলাউদ্দিন আল আজাদের 'স্মৃতিস্তম্ভ', হাসান হাফিজুর রহমানের 'অমর একুশে', আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'একুশে ফেব্রুয়ারি', আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর ' কোনো এক মাকে', সৈয়দ শামসুল হকের 'একুশের কবিতা', মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর 'একুশের গাথা', ফজল শাহাবুদ্দীনের 'আত্মা থেকে একটি দিন', আল মাহমুদের 'একুশের কবিতা', মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের 'কৃষ্ণচূড়ার মেঘ', দিলওয়ারের 'একুশের কবিতা', আবু হেনা মোস্তফা কামালের 'একুশের কবিতা', বেলাল চৌধুরীর 'বর্ণমালার নিরস্ত্র সাহস', হায়াৎ মামুদের 'ঘুরে ফিরে ফাল্‌গুন', শহিদ কাদরীর 'একুশের স্বীকারোক্তি', রফিক আজাদের 'পঞ্চানন কর্মকার', আসাদ চৌধুরীর 'ফাল্‌গুন এলেই', আবদুল মান্নান সৈয়দের 'একুশে ফেব্রুয়ারি', মোহাম্মদ রফিকের 'মহান একুশে', মহাদেব সাহার 'তোমরা কী জান', নির্মলেন্দু গুণের 'আমাকে কী মাল্য দেবে দাও', হুমায়ুন আজাদের 'বাংলা ভাষা', আবুল হাসানের 'মাতৃভাষা', মাহবুব সাদিকের 'অবিনাশী বাংলা', আবুল মোমেনের 'আমি কি ভুলিতে পারি', অসীম সাহার 'মধ্যরাতের প্রতিধ্বনি', মুহম্মদ নূরুল হুদার 'মাতৃভাষা' ইত্যাদি। একুশ-পরবর্তী অর্ধশত বছরে এদেশের কবিদের সত্তায় প্রবহমান একুশের চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে এসব কবিতায়।

তিন

একুশের গল্প-রচনার সূত্রপাত হাসান হাফিজুর রহমান-সম্পাদিত একুশের প্রথম সংকলন একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে। এ-সংকলনে প্রকাশিত একুশের গল্পগুলো হচ্ছে: শওকত ওসমানের 'মৌন নয়', সাইয়িদ আতীকুল্লাহর 'হাসি', আনিসুজ্জামানের 'দৃষ্টি', সিরাজুল ইসলামের 'পলিমাটি', আতোয়ার রহমানের 'অগ্নিবাক'।

শওকত ওসমানের ' মৌন নয়' গল্পটি ভাষা-আন্দোলন নিয়ে লেখা প্রথম একুশের গল্প। একুশের প্রথম কবিতার মতো এটি লেখা হয় চট্টগ্রামে। গল্পটি যেমন চলচ্চিত্রধর্মী, তেমন নাটকীয়। গল্পে একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনার রূপক উপস্থাপন করেছেন লেখক। একটি চলন্ত বাসের সমস্ত যাত্রীর নিস্তব্ধতার ভেতর দিয়ে একুশের মর্মান্তিক শোকাবহ ঘটনার মানস প্রতিক্রিয়াকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এ-গল্পে। গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন পুত্রশোকে স্তব্ধ এক বৃদ্ধ যাত্রী। কিন্তু এক সময় পুত্রশোককাতর বৃদ্ধ পিতার আর্তনাদে সে-স্তব্ধতা খান-খান হয়ে ভেঙে যায় : 'কী দোষ করেছিল আমার ছেলে? ওরা কেন তাকে গুলি

করে মারল?' সব যাত্রী এমনকি ড্রাইভারও তার দিকে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয়। বৃদ্ধের ক্ষোভ নিমেষেই সঞ্চারিত হয় সবার মধ্যে।

সাইয়িদ আতীকুল্লাহর 'হাসি' গল্পে দেখা যায়, আবু

ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় হলে আবুর নীহার খালাও তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। একুশে ফেব্রুয়ারি গুলি চললে অন্য কয়েকজনের সঙ্গে আবুও গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। তার লাশ বাসায় আনা হলে প্রচণ্ড শোকে নীহার খালা ভেঙে পড়েন।

আনিসুজ্জামানের 'দৃষ্টি' গল্পে একুশে ফেব্রুয়ারির হৃদয়বিদারক ঘটনা চিত্রিত হয়েছে একটি দরিদ্র পরিবারকে ঘিরে। পেনশনভোগী কেরানি সাদত সাহেবের চশমা ভেঙে গেলেও অভাবের কারণে নতুন চশমা কেনা হয় না। তাঁর চাকরিজীবী পুত্র আসাদ একুশে ফেব্রুয়ারির মিছিলে যোগ দিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হলে পরিবারটিতে বিপর্যয় নেমে আসে। বৃদ্ধ কেরানি অন্ধদৃষ্টিতে মনে-মনে আঁকেন আসাদের জন্ম-আসন্ন সন্তানের ছবি।

আতোয়ার রহমানের 'অগ্নিবাক' গল্পের নায়ক মনি। দেশবিভাগের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মুখে বাবা, মা, ভাই-বোনের সঙ্গে মনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে চলে আসে ঢাকায়। এখানে স্থিতু হতে না হতেই শুরু হয় ভাষা-আন্দোলন। মনি সে-আন্দোলনে যোগ দেয় এবং পুলিশের গুলিতে শহিদ হয়।

একুশের গল্পের প্রথম ও একমাত্র উল্লেখযোগ্য সংকলন রশীদ হায়দার-সম্পাদিত একুশের গল্প। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি থেকে এটি প্রকাশিত হয়। এতে একুশ নিয়ে লেখা তিন দশকের প্রতিনিধিত্বশীল কিছু গল্প স্থান পায়। হাসান হাফিজুর রহমান-সম্পাদিত একুশে ফেব্রুয়ারি সংকলনে অন্তর্ভুক্ত সাইয়িদ আতীকুল্লাহর 'হাসি' গল্পটি ছাড়া অন্য গল্পগুলো অন্তর্ভুক্ত হয় এতে। এর বাইরে এই নতুন গল্পগুলো এতে স্থান পায় : সত্যেন সেনের 'ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগ্রামী', রণেশ দাশগুপ্তের 'কাঁথা সেলাই হইছে নিশ্চিন্ত', অজিতকুমার গুহের 'বুলু', সরদার জয়েনউদ্দীনের 'খরস্রোত', মির্জা আবদুল হাইয়ের 'আমরা ফুল দিতে যাব', আবু ইসহাকের 'পন্ডশ্রম', শহীদুল্লা কায়সারের 'এমনি করেই গড়ে উঠবে', মঈদ-উর রহমানের 'সিঁড়ি', আনিস চৌধুরীর 'চেতনার চোখ', মিন্নাত আলীর 'রুম বদলের ইতিকথা', আলাউদ্দিন আল আজাদের 'হস্তান্তর', মুর্তজা বশীরের 'কয়েকটি রজনীগন্ধা', মাফরুহা চৌধুরীর 'সেদিনের এক লগ্ন', শহিদ আকন্দের 'যখন পারি না', জহির রায়হানের 'একুশে ফেব্রুয়ারি', সৈয়দ শামসুল হকের 'সম্রাট', রাবেয়া খাতুনের 'প্রথম বধ্যভূমি', রশীদ আল হেলালের 'বরকত যখন জানত না সে শহিদ হবে', বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের 'আমি খুনি হতে চাই না', শওকত আলীর 'অবেলায় পুনর্বার', রাজিয়া খানের 'শহিদ মিনার', আবুল

হাসানাতের 'আরও কিছু রক্ত', নূর-উল আলমের 'একালের রূপকথা', মকবুলা মনজুরের 'শপথের সূর্য', খালেদা এদিব চৌধুরীর 'বাইশ বছর পরে', রিজিয়া রহমানের 'জ্যোৎস্নার পোস্টার', জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের 'স্মৃতিময়', মাহমুদুল হকের 'ছেঁড়া তার', আনোয়ারা সৈয়দ হকের 'দাগ', রশীদ হায়দারের 'সুদূরের শহিদ', জুলফিকার মতিনের 'জাতিস্মরেরা', হরিপদ দত্তের 'তার ফিরে আসা', সেলিনা হোসেনের 'ফিরে দেখা', হারুন হাবিবের 'শিকড়', পূরবী বসুর 'মায়ের দ্বিতীয় বিবাহ', তাপস মজুমদারের 'কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সম্পর্কিত একটি গল্পকরী খসড়া-সম্পর্ক : ১৯৫২-২০৫২', মুহম্মদ জাফর ইকবালের 'সংকোচ' এবং আহমদ বশীরের 'উনিশ শ তিয়াত্তরের একটি সকাল', মইনুল আহসান সাবেরের 'মরে যাওয়ার সময় হয়েছে'। এসব গল্পের কয়েকটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করছি।

সরদার জয়েনউদ্দীনের 'খরস্রোত' গল্পে ১৯৫০-এর দশকে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ভাষা-আন্দোলনের যে-প্রভাব পড়েছিল সে-দিকটি ফুটে উঠেছে। অবসরপ্রাপ্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছেলে মুনিরের জন্যে চাকরি ঠিক করে রেখেছিলেন। কিন্তু সে ব্যস্ত একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের প্রস্তুতি নিয়ে। এজন্যে তার ওপর অসন্তুষ্ট তিনি। তিনি ছেলেকে বাইরে যেতে নিষেধ করেন। কিন্তু মুনির জানায়, দেশের জন্যে তার কিছু করার আছে। সেদিন সে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়। পরদিন অন্য ছেলেরা আসে মুনিরের খোঁজে। আপ্লুত হন তিনি। একাত্ম হয়ে যান ছেলেদের সঙ্গে।

মির্জা আবদুল হাইয়ের 'আমরা ফুল দিতে যাবো' গল্পে ভাষা-আন্দোলনকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। ভাষা-আন্দোলনের পক্ষাবলম্বন করায় ম্যাজিস্ট্রেট আফসার উদ্দিন পাকিস্তান সরকারের নির্যাতনের শিকার হন ও হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। শাসকগোষ্ঠীর মন রক্ষা করতে গিয়ে কফিল উদ্দিন হাওলাদার ম্যাজিস্ট্রেট আফসার উদ্দিনের বিরুদ্ধে ইন্ধন জুগিয়ে প্রকারান্তরে তার মৃত্যুর কারণ হন। হাওলাদার সাহেব এজন্য শেষ বয়সে অনুতপ্ত হন এবং একুশের বিশেষ সংখ্যায় এই মর্মে বিজ্ঞাপন দেন যে, আফসার সাহেবের পুত্র যেন অবশ্যই তার সঙ্গে দেখা করে। এই বিজ্ঞপ্তি দেখে আফসার সাহেবের পুত্র মুরাদ তার সঙ্গে দেখা করতে যায়। হাওলাদার সাহেব তার কাছে দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চান। ঘটনা শুনে মুরাদ অচেতন হয়ে পড়ে।

মঈদ-উর-রহমানের ময়ূরের পা (১৯৫৮) গ্রন্থের 'সিঁড়ি' গল্পে বর্ণিত হয়েছে ভাষা-আন্দোলনের দুর্দমনীয় প্রভাবে ভীত পাকিস্তান সরকারের দমন-নীতির দিক। ভাষা-আন্দোলনের কর্মী সিরাজকে কারাবন্দি করা হলে পরিবারে তৈরি হয় সংকট। দুবছর পর তার মুক্তির দিন ঘনিয়ে এলে পরিবারটি নতুন আশায়

বুক বাঁধে। কিন্তু নতুন করে আবার তাকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়।

আনিস চৌধুরীর 'চেতনার চোখ' গল্পে দেখানো হয়েছে সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কায়েমি স্বার্থ যেভাবে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার স্বরূপ। মানুষের সত্যিকারের আশা-আকাঙক্ষার চিত্র তুলে ধরবে বলে শাহেদ শিক্ষকতা ছেড়ে সাংবাদিকতার পেশা বেছে নেয়। কিন্তু একুশের ঘটনার প্রকৃত প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে সে দেখে, তার দরকারি অংশ বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। সে সাংবাদিকতা ছেড়ে আবার পুরনো পেশায় ফিরে যায়।

মিন্নাত আলীর 'রুম বদলের ইতিকথা' গল্পটি গড়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের একটি কক্ষকে কেন্দ্র করে। কক্ষটি যার নামে বরাদ্দ ছিল সেই আনিস ভাষা-আন্দোলনে নিহত হয়। এরপর সেই ঘরে আসে নতুন ছাত্র। সে-ই এ-গল্পের কথক। ঘটনাচক্রে সে জানতে পারে আনিসের মৃত্যুর ঘটনা। বিজ্ঞানের ছাত্র আনিস মিছিলে যোগ দিয়েছিল। গুলিতে আহত হয়ে পরদিন সে হাসপাতালে মারা যায়। এ-ঘটনা শোনার পর রুমে এলেই নতুন ছাত্রটির মনে জাগে আনিসের দুর্বিষহ মৃত্যুর ঘটনা। রাতে তার ঘুম হয় না। শেষ পর্যন্ত সে রুম বদল করতে বাধ্য হয়।

জহির রায়হানের 'একুশের গল্প' প্রতীকী তাৎপর্যমত। গল্পের কাহিনি এরকম : রাহাতের বন্ধু মেডিক্যালের ছাত্র তপুর এক পা খাটো ছিল। সে স্ত্রীর বাধা না মেনে একুশের মিছিলে যোগ দেয়। পুলিশ গুলি চালালে গুলি তার কপালে লাগে। তার লাশ আর পাওয়া যায়নি। ছাত্রাবাসে চার বছর তার সিট খালি পড়ে ছিল। নতুন রুমমেট অ্যানাটমি পড়ছিল। একটা কঙ্কালের মাথার খুলির সঙ্গে পড়া মেলাতে গিয়ে সে হঠাৎ লক্ষ করে খুলির মাঝখানে গর্ত। কথাটা জেনেই রাহাত কঙ্কালের জন্য হাড়গুলো পরীক্ষা করে। দেখে বাঁ-পায়ের হাড় দুই ইঞ্চি ছোট। রাহাত অবাক বিস্ময়ে নিশ্চিত হয়, এ-কঙ্কাল তপুর। গল্পটি এভাবে নাটকীয়তার মধ্যে শেষ হয়।

রাবেয়া খাতুনের 'প্রথম বধ্যভূমি' গল্পে স্কুলশিক্ষক সাবেরের চরিত্রকে কেন্দ্র করে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের একুশের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ-ঘটনায় তার পুত্র সাহেদ মারা যায়। পুলিশ তার লাশ গুম করে। শহিদদের স্মরণে তৈরি হয় শহিদ মিনার।

বশীর আল হেলালের 'বরকত যখন জানত না সে শহিদ হবে' গল্পটি শহিদ বরকতের সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত পরিচয়ের আলোকে লেখা বর্ণনাসমৃদ্ধ স্মৃতি-আলেখ্য।

নূর-উল আলমের পুতুলের কান্না (১৯৫৭) গ্রন্থের 'একালের রূপকথা' গল্পটি গড়ে উঠেছে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা অবলম্বনে। একুশ উদযাপনে বাধা দিতে গিয়ে পুলিশি নির্যাতনের ঘটনা এ-গল্পের উপজীব্য।

মাহমুদুল হকের 'ছেঁড়া তার' দুই বন্ধুর কাহিনি। দুজনই ভাষা-আন্দোলনের কর্মী। আন্দোলনের পোস্টার লাগাতে গিয়ে সরকার সমর্থক গুন্ডাদের হামলায় আহত হয়ে এদের একজন চিরতরে পঙ্গু হয়ে যায়।

সেলিনা হোসেনের উৎস থেকে ফেরা গ্রন্থের 'দীপান্বিতা' গল্পে একুশের দিনের ঘটনাকে তুলে ধরা হয়েছে একজন পুলিশের চরিত্রকে কেন্দ্র করে। পুলিশ বিভাগের চাকুরে সাদৎ আলী কর্তব্যপরায়ণতার জন্যে তিন-তিনবার পুরস্কার পেয়েছেন। তার পুত্র মবিন ভাষা-আন্দোলনে যুক্ত থাকায় তিনি খুব চিন্তিত। একুশ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় গেটে তার দায়িত্ব পড়ে। দায়িত্বজ্ঞান ও কর্তব্যনিষ্ঠা থেকে তিনি মিছিলের দিকে রাইফেল তাক করেন। কিন্তু অন্য পুলিশ গুলি চালালেও শেষ পর্যন্ত তিনি গুলি চালাতে পারেন না। চাকরি যাওয়া ও শাস্তি পাওয়ার ভয় সত্ত্বেও তিনি ঝুঁকে পড়েন ভাষা-আন্দোলনের সমর্থকদের পক্ষে।

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে লেখা 'মীর আজিমের দুর্দিন' গল্পে সেলিনা হোসেন একুশের ঘটনাকে উপস্থাপন করেছেন ষাট বছরের বৃদ্ধ মীর আজিমের বিশ্লেষ স্মৃতিভারাতুর চোখে। তাঁর জীবনে ভাষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার স্মৃতি সজীব। কিন্তু তাঁর দুঃখ তাঁর সন্তান মাসুদের কাছে একুশের আত্মত্যাগ গুরুত্ব পায় না।

আহমদ বশীরের 'উনিশ শ তিয়াত্তরের একটি সকাল' গল্পে ফুটে উঠেছে আমাদের স্বপ্ন-প্রত্যাশার প্রতিবন্ধকতা। এ-গল্পেও এসেছে স্বাধীনতা-পরবর্তী নতুন প্রজন্মের প্রসঙ্গ। একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ নতুন প্রজন্মের কিছু যুবক স্বাধীনতার চেতনা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় উদ্যোগী হয়। কিন্তু তারা শিকার হয় প্রতিপক্ষের আক্রমণের।

এভাবে একুশের গল্পগুলোর ভেতর দিয়ে ফুটে উঠেছে ভাষা-আন্দোলনের ঘটনাধারা, পুলিশের বর্বরতা, ভাষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি সরকারের নিষ্ঠুর মনোভাব, তাদের বিরুদ্ধে ধরপাকড়, গ্রেফতার, হুলিয়া ইত্যাদি পুলিশি তৎপরতা, শহিদদের আত্মদান, সারা দেশে ঘটনার খবরের দ্রুত বিস্তার, একুশের ঘটনাকে ঘিরে সর্বস্তরের মানুষের আবেগ-উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, আন্দোলনে যোগ দেওয়া না-দেওয়া নিয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, পাকিস্তানি স্বাধীনতা সম্পর্কে মোহমুক্তি, ভাষা-আন্দোলনের যুগান্তকারী প্রভাব ইত্যাদি।

একুশের পটভূমিতে যে-অসাম্প্রদায়িক মানবিক চেতনার জাগরণ ঘটেছিল তা আলোড়ন তুলেছিল নতুন প্রজন্মের লেখকদের সৃজনে ও মননে। একুশের চেতনা থেকেই জন্ম নিয়েছিলেন বেশ কয়েকজন শক্তিশালী ছোটগল্পকার। এঁদের মধ্যে রয়েছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ, মুর্তজা বশীর, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, জহির রায়হান, সৈয়দ শামসুল হক, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, রাবেয়া খাতুন প্রমুখ।

চার.

নাট্য ও থিয়েটারের ক্ষেত্রে আমাদের যে বর্তমান অগ্রগতি তার পেছনেও একুশের চেতনা ফেলেছে অসামান্য প্রভাব।

ভাষা-আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠার সময়েই এ-নিয়ে নাটক লেখা হয়েছে। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে লেখা আসকার ইবনে শাইখের নাটকটির নাম দুর্যোগ। এটি তাঁর দুরন্ত ঢেউ (১৯৫১-৫৩) নাট্যগ্রন্থে সংকলিত। আসকার ইবনে শাইখ ভাষা-আন্দোলনের সহযোদ্ধাদের নিয়ে লিখেছেন আর একটি নাটক। নাটকটির নাম যাত্রী (১৯৫৪)। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের একুশে ফেব্রুয়ারিতে অর্থাৎ একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম বার্ষিকীতে মুনীর চৌধুরীর লেখা বিখ্যাত কবর নাটকের প্রথম অভিনয় হয়েছিল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। কারান্তরালেই এ-নাটক লিখেছিলেন মুনীর চৌধুরী। অভিনয় করেছিলেন কারাবন্দিরাই। পরের বছর কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে নাটকটি অভিনীত হয়।

একুশের অনির্বাণ চেতনা ও অপরিমেয় আত্মত্যাগের কাহিনি শৈল্পিক উৎকর্ষে প্রতিভাসিত হয়েছে কবর নাটকে। এই নাটকে উঠে এসেছে সেইসব মৃত্যুঞ্জয়ী শহিদ চরিত্র, যাঁদের গুলি করে হত্যা করা যায়; কিন্তু তাঁরা তাঁদের সংকল্পে থাকেন অটুট। এ-নাটক আমাদের নাট্যসাহিত্যে নতুন দ্যুতিতে ভাস্বর।

এভাবে একুশের চেতনা বাংলাদেশের নাট্য-আন্দোলনে বাঙালির জাতীয় চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করেছিল। পরবর্তীকালে এই ধারায় কয়েকটি নাটক রচিত হয়েছে, হয়েছে নাটকের অভিনয়। ভাষা-আন্দোলন নিয়ে লেখা মমতাজ উদদীনের নাটক হচ্ছে বিবাহ।

মিলন চৌধুরীর পথনাটক যায় দিন ফাগুনের দিনে

ভাষা-আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ প্রতিফলিত হয়েছে। শোভাময় ভট্টাচার্যের নাটক একুশের ইতিবৃত্তও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হলেও অভিনীত হয়েছে এমন নাটকও রয়েছে।

যেমন : রেজ্জাকুল হায়দারের হরমুজ আলীর একুশ, আলী আনোয়ারের বোবা মিনার, রফিউল কাদের রুবেলের ভাষা বদল ইত্যাদি।

পাঁচ.

ভাষা-আন্দোলনের চেতনার প্রভাব লক্ষ করা যায় সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো উপন্যাসেও। কিন্তু তা তেমন গভীর বা ব্যাপক নয়। একুশের পটভূমিতে তাৎক্ষণিকভাবে কবিতা, গল্প ও নাটক রচনার সূচনা হলেও একুশের উপন্যাস পাওয়ার জন্যে কিছুটা সময় আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে। ভাষা-আন্দোলন বা একুশের ঘটনাভিত্তিক না-হলেও অনুষঙ্গ হিসেবে কিংবা কোনো চরিত্রের স্মৃতিতে ভাষা-আন্দোলনের প্রসঙ্গ এসেছে কোনো-কোনো উপন্যাসে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আতহার আহমেদের উন্মোচন (১৯৫৬) ও পিপাসা (১৯৫৮), দিলারা হাশেমের ঘর মন জানালা (১৯৬৫), বাঙ্গাল আবু সাঈদের ব্যতিক্রম (১৯৬৫), আবু রুশদের নোঙর (১৯৬৭), আনিস সিদ্দিকীর মন না মতি (১৯৬৮), রাবেয়া খাতুনের রাজাবাগ শালিমার বাগ (১৯৬৯) ও আবদার রশীদের লঘুমেঘ (১৯৭০)। উন্মোচন ও ব্যতিক্রম উপন্যাসে ভাষা-আন্দোলনের প্রতিফলন তাৎপর্যময় হয়ে ওঠেনি। পিপাসার নায়ক একুশের স্মৃতিচারণ করে। কিন্তু উপন্যাসের কাহিনির সঙ্গে তার কোনো প্রত্যক্ষ যোগসূত্র লক্ষ করা যায় না। 'ঘর মন জানালা' উপন্যাসে শহিদ দিবস পালনের বর্ণনা আছে। তবে চরিত্রহীন আকতারকে এখানে নেতৃত্বের ভূমিকায় আনা হয়েছে। তা একুশের চেতনার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে না। মন না মতি উপন্যাসের নায়ক রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে মুসলিম লীগের নেতাদের ভূমিকার বিরূপ সমালোচনা করলেও কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহকে বাংলা ভাষাবিরোধী ভূমিকার ঊর্ধ্বে রাখতে প্রয়াসী হয়। রাজাবাগ শালিমার বাগ উপন্যাসের প্রধান শিক্ষয়িত্রী পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নেকনজরে থাকতে আগ্রহী। নিজের চাকরির স্বার্থে এবং প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রচেষ্টায় তিনি একুশের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে দ্বিধাগ্রস্ত। লঘুমেঘ উপন্যাসে একুশের শহিদদের প্রতি মনোভাবের ক্ষেত্রে নায়কের মধ্যে দোলাচল মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এ-উপন্যাসের নায়ক আন্দোলনের দিন ঘুমিয়ে কাটায়। তবে আন্দোলনে যোগ না দেওয়ায় তার অনুশোচনা হলে পরদিন সে আন্দোলনে যোগ দেয়।

এসব উপন্যাসে প্রাসঙ্গিকভাবে একুশের চিত্র এসেছে, কিন্তু সেগুলোতে একুশের চেতনার সার্থক রূপায়ণ ঘটেনি। তাছাড়া মূল কাহিনির সঙ্গে সেগুলোর যথাযথ মেলবন্ধনও ঘটেনি।

এদিক থেকে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও আবু রুশদের নোঙরে ভাষা-আন্দোলনের যৌক্তিক উপস্থাপন লক্ষ্য করা যায়। এ-উপন্যাসের এক পর্যায়ে ভাষা-আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বাস্তবসম্মতভাবে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা ভাষা সম্পর্কে একজন অবাঙালি বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করলে তার বিরুদ্ধে

একজন বাঙালি তরুণের তীব্র প্রতিবাদের ঘটনা এখানে বর্ণিত হয়েছে। তবে পাশাপাশি চাকরিচ্যুতির আশঙ্কায় অন্য একজন বাঙালি তরুণের আপসকামী ভূমিকাও স্থান পেয়েছে। বোঝা যায়, এ-উপন্যাসে লেখক রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে সমকালের পরস্পরবিরোধী নানা দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তবতাকেই চিত্রিত করতে চেয়েছেন।

একুশের ঘটনানির্ভর প্রথম উপন্যাস বা উপন্যাসোপম বড় গল্প সম্ভবত তা সেন-রচিত 'লাল রং পলাশ'। এটি চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দ্বিমাসিক কলরোল পত্রিকায় (১৯৬৫) প্রকাশিত হয়। একুশের ঘটনা নিয়ে লেখা জহির রায়হানের আরেক ফাল্গুন উপন্যাসের আগে এটি রচিত ও প্রকাশিত।

ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিতে এবং এ-আন্দোলনকে বিষয় করে লেখা প্রথম গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস জহির রায়হানের আরেক ফাল্গুন (১৯৬৯)। এটিই একুশের প্রথম সার্থক উপন্যাস যেখানে একুশের চেতনা শৈল্পিক উৎকর্ষে উজ্জ্বল। এ-উপন্যাসে বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতিসত্তার মর্মচেতনাকে এক বিশেষ সময়ের প্রেক্ষাপটে ধারণ করা হয়েছে। এ-উপন্যাস রচনার প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে

ভাষা-আন্দোলনে জহির রায়হানের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। এ-উপন্যাসের কাহিনির ব্যাপ্তিকাল মাত্র তিন দিন, দুই রাত। কিন্তু এই সীমিত পরিসরেই নানা ঘটনা-উপঘটনার মধ্য দিয়ে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে একুশ উদযাপনের উদ্যোগ, পরিস্থিতিগত উত্তেজনা, একুশের অনুষ্ঠান উদযাপন বানচালে সরকারি তৎপরতা ইত্যাদি সুবিন্যস্তভাবে চিত্রিত হয়েছে। কাহিনির ফাঁকে-ফাঁকে ফ্ল্যাশব্যাকে বর্ণিত হয়েছে বায়ান্নর একুশের ঘটনা। উপন্যাস শেষ হয়েছে একুশের চেতনাকে হৃদয় থেকে হৃদয়ে সঞ্চারিত করার প্রয়াসের মাধ্যমে।

সেলিনা হোসেনের যাপিত জীবন (১৯৮১) একুশের ঘটনাভিত্তিক উল্লেখযোগ্য আরেকটি উপন্যাস। দেশবিভাগ থেকে ভাষা-আন্দোলন এই কালপর্বে এ-উপন্যাসের কাহিনি বিস্তৃত।

বৃক্ষপ্রেমিক বোটানির শিক্ষক সোহরাব আলি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎস স্মৃতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর ছেড়ে সপরিবারে ঢাকায় আসেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করার চক্রান্তে লিপ্ত হলে তাঁর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আন্দোলনে অংশ নিতে শুরু করে তাঁর মেজ ছেলে জাফর। সে ভাষাভিত্তিক স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে। ভাষা-আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্যে পাকিস্তান সরকার নানা অপপ্রচারে লিপ্ত হয়। আন্দোলনকারীদের সভা-সমাবেশ পণ্ড করার জন্যে গুন্ডা লেলিয়ে দেয়। কিন্তু আন্দোলন ক্রমেই

জোরদার হতে থাকে। জাফরের প্রেমিকা আঞ্জুমও জাফরের সঙ্গে আন্দোলনে শামিল হয়। একুশে ফেব্রুয়ারির মিছিলে আঞ্জুম-জাফর একসঙ্গে মিছিল করে। পরে জাফর চলে যায় আরেক মিছিলে। পুলিশের গুলিতে জাফর শহিদ হয়। মিছিলে দেখা যায় তার রক্তমাখা জামা। এরপর সে মিছিল আরো বড় হয়। তাতে যোগ দেয় জাফরের পিতা সোহরাব আলি, ভাই দীপু। আর আঞ্জুমের চোখে সে মিছিল হয়ে ওঠে জাফরের প্রতীক। আঞ্জুম বিশ্বাস করতে পারে না যে, জাফর নেই। সে বিড়বিড় করে বলে, 'তোমাকে আমি কিছুতেই মরতে দেব না।' উপন্যাসের শেষে এই ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, চরম বর্বরতা সত্ত্বেও বাঙালির মিছিল দমানো অসম্ভব। বরং তা দিনে-দিনে আরো শক্তি অর্জন করবে।

সেলিনা হোসেনের নিরন্তন ঘণ্টাধ্বনি (১৯৮৭) উপন্যাসেও ভাষা-আন্দোলনের নানা প্রসঙ্গ এসেছে। দেশবিভাগের পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাবলির ধারায় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলির সঙ্গে পূর্বে 'যাপিত জীবন' উপন্যাসের ঘটনাবলির সাদৃশ্য এখানে লক্ষণীয়। যাপিত জীবন উপন্যাসের মতোই এ-উপন্যাসে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও তার এদেশীয় দোসরদের ষড়যন্ত্র, এবং এর বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন বর্ণিত হয়েছে। তবে এ-উপন্যাসে ভাষা-আন্দোলন এসেছে পূর্ববর্তী ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন ও পরবর্তীকালীন সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনের মধ্যেকার যোগসূত্র হিসেবে।

শওকত ওসমানের আর্তনাদ (১৯৯৫) তাঁর 'মৌন নয়' গল্পের সম্প্রসারিত রূপ। এ-উপন্যাসে একুশের পটভূমিতে বাঙালি জাতির শোকাবহ আর্তনাদ ও সংগ্রামী চেতনাকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে উপস্থাপন করা হয়েছে। ভাষাসংগ্রামে নিহত পুত্র আলি জাফরের শোকবিহবল পিতার আর্তনাদ এ-উপন্যাসের উপজীব্য। ভাষা-আন্দোলনকারীদের পাকিস্তান ধ্বংসের জন্য চিহ্নিত ও দায়ী করে এবং তাদের হত্যাকে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রতীয়মান করার জন্যে পাকিস্তানি শাসকচক্র ও তাদের এদেশীয় দালালরা যে খোঁড়া যুক্তি তুলেছিল তার বিরুদ্ধে ভাষা-আন্দোলনকারীদের উপযুক্ত জবাবদান এবং মাতৃভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ এ-উপন্যাসের মূল বিষয়। এ-উপন্যাসে দেশবিভাগোত্তর নানা পরিস্থিতি ও নানা রাজনৈতিক-সামাজিক ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে কাহিনির বিভিন্ন অংশে। এভাবে উপন্যাসে ভাষা-আন্দোলনের সঙ্গে বাঙালির প্রাণসত্তার মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে।

ছয়.

একুশের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে এদেশে কত যে প্রবন্ধ লেখা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বর্তমান প্রবন্ধে সেগুলো নিয়ে আলোচনার সুযোগ তেমন নেই। এখানে কেবল একুশে ও ভাষা-আন্দোলন বিষয়ক গ্রন্থগুলোর কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। আবদুল হকের ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব (১৯৭৬) পরিসরে ছোট হলেও ভাষা-আন্দোলন নিয়ে লেখা মূল্যবান গ্রন্থ। ভাষা-আন্দোলন নিয়ে লেখা অন্যান্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে : বদরুদ্দীন উমরের ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৮০), বশীর আল হেলালের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস (১৯৮৫), রফিকুল ইসলামের শহিদ মিনার (১৯৮৫) ও বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন (২০০৬), হায়াৎ মামুদের অমর একুশে (১৯৮৫), মুস্তাফা নূরউল ইসলামের মাতৃভাষা চেতনা ও ভাষা আন্দোলন, হুমায়ুন আজাদের ভাষা আন্দোলন সাহিত্যিক পটভূমি (১৯৯০), আহমদ রফিকের ভাষা আন্দোলন : ইতিহাস ও তাৎপর্য (১৯৯১) এবং ভাষা আন্দোলনের কিছু স্মৃতি ও কিছু জিজ্ঞাসা (১৯৯৩), শামসুল আলম সাঈদের বাঙালি জীবনে একুশ (১৯৯৪), আবুল আহসান চৌধুরীর বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ভাষা আন্দোলন (১৯৯৭), বশীর আল হেলালের ভাষা আন্দোলনের এই মোহনায় (২০০৩) ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সেলিনা হোসেন, নূরুল ইসলাম ও মোবারক হোসেনের সম্পাদনায় ২০০০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত অমর একুশে প্রবন্ধ গ্রন্থটিও স্মরণীয়। এটি একুশের প্রবন্ধের একটি প্রতিনিধিত্বশীল সংকলন। এতে পাঁচ দশকের প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলোর মধ্যে রয়েছে : মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা', কাজী মোতাহার হোসেনের 'একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত চিন্তা', জীবনানন্দ দাশের 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ', মুহাম্মদ কুদরত-এ-খুদার 'ওদের স্মরণে', আবুল ফজলের 'একুশ মানে মাথা নত না করা', সৈয়দ মুজতবা আলীর 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা', আবুল হাশিমের 'ভাষা-আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত দিনগুলো', মুহম্মদ এনামুল হকের 'পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা', সত্যেন সেনের 'ধন্য একুশে ফেব্রুয়ারি', আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'একুশে ফেব্রুয়ারি : পুনর্মূল্যায়ন', অজিত কুমার গুহের 'ভাষা-আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', আবদুল হকের 'ভাষা-আন্দোলনের পটভূমি,' মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের 'আমাদের ভাষা ও সাহিত্য', আহমদ শরীফের 'ভাষা প্রসঙ্গে বিতর্কের অন্তরালে', মুনীর চৌধুরীর 'মাতৃভাষা', শহীদুল্লা কায়সারের 'একুশের পর', মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর 'ভাষা ও সংস্কৃতি', জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর 'ভাষা

প্রসঙ্গে ভিন্ন ভাবনা', আহমদ রফিকের 'স্মৃতি একুশ : বর্তমানের আলোয়', বদরুদ্দীন উমরের 'জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও একুশে ফেব্রুয়ারি', আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ভাষা আন্দোলন অর্ধশতাব্দী পরেও', রফিকুল ইসলামের 'শহিদ মিনারের ইতিহাস', আনিসুজ্জামানের 'একুশে ফেব্রুয়ারি ও আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনা', হাসান আজিজুল হকের 'একুশের আন্দোলন', আবুল কাসেম ফজলুল হকের 'একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের মর্মকথা', সেলিনা হোসেনের 'সংস্কৃতি ও অমর একুশে' ইত্যাদি।

সাত.

একুশের সাহিত্যে উঠে এসেছে ভাষা-আন্দোলনের ঘটনাবলি। সেইসঙ্গে তাতে যুক্ত হয়েছে এদেশের কবি, গল্পকার, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিকের নবতর জীবনবোধ। পাকিস্তান আমলের সাম্প্রদায়িক, ধর্মীয় জজবা থেকে বাঙালি জাতিসত্তায় উত্তরণের ক্ষেত্রে বাঙালির জীবনে যে অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার উন্মেষ ঘটেছিল তার প্রভাব পড়েছে একুশের সাহিত্যে। বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদের ভাষা হয়েছে একুশের সাহিত্য। বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার প্রতি গভীর মমতার উন্মেষ ঘটিয়েছে তা। একুশের সাহিত্যের মাধ্যমেই ফুটে উঠেছে আমাদের জাতিসত্তার পরিচয়, লিপিবদ্ধ হয়েছে আমাদের ইতিহাসের গৌরবগাঁথা।

একুশের সাহিত্যই নতুন কালে, নতুন পরিবেশে আমাদের সাহিত্যের মূলধারা হয়ে অর্জন করেছে নব-নব মাত্রা।

লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত গবেষক, ভাষাবিজ্ঞানী ও অধ্যাপক।

বাংলা ভাষার বাংলাদেশ

প্রফেসর ড. আবদুল খালেক

মানুষের ভাষা আছে, অন্যান্য প্রাণীর ভাষা বলতে কিছু নেই। মানুষ সামাজিক জীব। প্রাণিজগতের অন্যদের সঙ্গে এখানেই মানুষের মূল পার্থক্য। বাংলা ভাষা, বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ আজ এক সুতোয় গাঁথা পড়ে গেছে। কোনো কিছুকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার পথ নেই। ইতিহাসপাঠে জানা যায়, বাঙালি জাতি মূলত ভাষাভিত্তিক জাতি।

যতদূর জানা গেছে, অতি প্রাচীনকালে ‘বং’ ভাষাভাষী এক জনগোষ্ঠী যে এলাকায় বসতি স্থাপন করেছিল, সেই এলাকা ধীরে ধীরে পরিচিতি লাভ করে ‘বং’ জনপদ হিসেবে। ‘বং’ জনপদের পাশাপাশি আরো কিছু জনপদ গড়ে উঠেছিল, যেমন গৌড়, রাঢ়, পুণ্ড্র, সূহ্ম, তাম্রলিপ্ত, সমতট ইত্যাদি।

জনপদগুলোর মধ্যে শক্তির লড়াই ছিল, সে লড়াইয়ে ধীরে ধীরে ‘বং’ জনপদ অন্যান্য জনপদের ওপরে আধিপত্য বিস্তার লাভ করতে সমর্থ হয়। কালের গতিধারায় ‘বং’ জনপদ অন্যান্য জনপদকে এক পর্যায়ে গ্রাস করে ফেলে। সেই ‘বং’ জনপদেরই এ কালের বিবর্তিত রূপ ‘বাংআলদেশ’ এবং সবশেষে বাংলাদেশ।

অতীত ইতিহাস পাঠে জানা যায় বাংলাদেশের উর্বর মাটি বিদেশিদের কাছে ছিল অতি লোভনীয়। যে কারণে যুগ যুগ ধরে দেশটি বিদেশিদের হামলার শিকার হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তার কবিতায় উল্লেখ করেছেন ‘ হেথা আর্য হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন। শক হুনদল, পাঠান মোঘল এক দেহে হলো লীন’। কতিপয় উদাহরণ এখানে তুলে ধরা যায়। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে দেশটি অশোক শাসনের অধীন ছিল। অশোক শাসনের পর গুপ্ত শাসন, এরপর পালদের শাসন। পালদের শাসনকালে বাংলা ভাষার প্রসার ঘটে, তার প্রমাণ বাংলা ভাষায় রচিত চর্যাপদ। পালদের পর এসেছে সেনরা। সেনদের সময় সংস্কৃত ভাষা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। বাংলা ভাষার প্রতি তারা অবজ্ঞা দেখিয়েছে। সেনদের পর দেশটি মুসলিম শাসকদের অধীনে আসে ১২০৩/৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে। মুসলিম শাসকেরা নিজেদের ফারসি ভাষাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা করে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ ইংরেজদের দখলে ছিল।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের বিভক্তি ঘটে। জন্ম লাভ করে পাকিস্তান নামের একটি নতুন রাষ্ট্র। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার মানুষ বিশ্বাস করেছিল, এবার তারা স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মলগ্নেই দেখা দেয় রাষ্ট্রভাষা নিয়ে সমস্যা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনক মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় এসে যখন ঘোষণা দেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, এই ঘোষণার বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক বাঙালি জাতি তার ভাষার প্রতি সব সময় আবেগপ্রবণ। নিজের ভাষার অবমাননা এ জাতি কখনো সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। নিজের মাতৃভাষার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে এদেশের মানুষকে জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছে। ভাষাশহিদদের রক্তের দিকে তাকিয়ে বাঙালি জাতি নতুন করে আত্ম আবিষ্কারের চেষ্টা চালায়। প্রাচীন সেন শাসনকাল থেকে ব্রিটিশ শাসনকাল পর্যন্ত বাঙালি জাতি হাজার বছর ধরে পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ ছিল, সে কারণে বাঙালি তার প্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পায়নি বটে, তবে নিজের

মাতৃভাষাকে বাঙালি জাতি সব সময় অন্তরে ধারণ করে রেখেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হাজার বছরের বাঙালি পরিচয় বাদ দিয়ে তাকে পরিচয় দিতে হয় পাকিস্তানি জাতি বলে। তার মাতৃভাষা বাংলা রাষ্ট্রভাষা হলো না, হাজার বছরের বাঙালি জাতীয়তা তার হারিয়ে গেল। তবে তার স্বাধীনতা থাকল কোথায়? তার মনে নানা প্রশ্ন। সে যদি বাঙালি, তবে তার রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবে না কেন? অন্যদিকে তার জাতীয়তা যদি পাকিস্তানি, সেক্ষেত্রে উর্দুকে সে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে পারছে না কেন? তার মধ্যে দেখা দেয় মারাত্মক আত্মপরিচয়ের সংকট।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষাশহিদদের রক্ত বাঙালি জাতিকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। রাজনৈতিক সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে গঠন করে যুক্তফ্রন্ট। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফার যে নির্বাচনি ইশতেহার প্রচার করে, তার মধ্যে বাংলা ভাষার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায়। সেখানে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়, যুক্তফ্রন্ট রাষ্ট্রক্ষমতায় যেতে পারলে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা হবে। যে বর্ধমান হাউজ থেকে ছাত্রদের মিছিলের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেই বর্ধমান হাউজকে বাংলা একাডেমি করা হবে। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হবে। বাংলা ভাষার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার কারণে পূর্ব বাংলার মানুষ বিপুল ভোটের মাধ্যমে যুক্তফ্রন্টকে জয়যুক্ত করে।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হলেও পশ্চিম পাকিস্তানিদের নানারকম ষড়যন্ত্রের কারণে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারেনি। আইয়ুব খান অস্ত্রের বলে পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করার পর থেকে তার সামরিক শাসনের সমস্ত আক্রোশ শেখ মুজিবের ওপর একে একে গিয়ে পড়তে থাকে। আইয়ুবের এক দশকের উর্ধ্বকাল শাসনামলে শেখ মুজিব প্রায় আট বছর কারাগারে আবদ্ধ থাকেন। কোনো কোনো সময় তার কারাবাসের মেয়াদ এক বছরের চেয়ে দীর্ঘায়িত হয়। এ ছাড়া অসংখ্য মামলা চাপিয়ে তাকে হয়রানি করা হতে থাকে। কিন্তু এতে মুজিবকে দমানো যায়নি। যখনই তিনি মুক্তি পেয়েছেন তখনই পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে এবং আইয়ুবীয় স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, ভাষণ দিয়েছেন। শেখ মুজিব ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে তার বিখ্যাত ছয় দফা দাবি ঘোষণা করেন।

ছয় দফাকে একটু নিবিষ্টচিত্তে বিশ্লেষণ করলে সহজেই অনুভব করা যায় যে, এর মধ্যে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার বীজ শুধু লুকিয়ে নেই, তা অঙ্কুরিত হয়েছে। সুচতুর আইয়ুব খান ও তার অনুসারীগণ উপলব্ধি করলেন যে, শেখ মুজিবকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই অর্থাৎ তাকে ফাঁসিতে লটকাতে

হবে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ২১ এপ্রিল একটি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি এস এ রহমানের নেতৃত্বে একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করে শেখ মুজিবকে প্রধান আসামি করে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। সে মামলার নামকরণ হয় রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব।

ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা দানা বেঁধে উঠতে থাকে। ষাটের দশকের স্লোগানের ভাষা তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা। তুমি কে আমি কে, বাঙালি বাঙালি। আগরতলা মামলার বিরুদ্ধে স্লোগান ওঠে 'জেলের তালা ভাঙব শেখ মুজিবকে আনব।' স্লোগানের ভাষা শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে ওঠে। '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের ফলে আইয়ুব খানের পতন ঘটে। শেখ মুজিব জেলখানা থেকে মুক্ত হয়ে এসে স্বাধীনতার নেতৃত্ব দিতে থাকেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মার্চের এক ঐতিহাসিক ভাষণে শেখ মুজিব বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। ভাষণটি তিনি শেষ করেন 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে। বঙ্গবন্ধুর 'জয় বাংলা' স্লোগানের পর পাকিস্তানের অস্তিত্ব শেষ হয়ে যায়। জন্ম হয় ভাষাভিত্তিক স্বাধীন বাংলাদেশের।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলনের সময় আমি গ্রামের স্কুলে পড়তাম। ভাষা আন্দোলন গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছিল। গ্রামের মেঠো পথ দিয়ে আমরা মিছিল করতাম আর স্লোগান দিতাম 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। কৃষকেরা আমাদের মিছিলে যোগদান করতেন। স্লোগানের ভাষা ভুল করে তারা বলে ফেলত 'বাংলা ভাষা রাষ্ট্র চাই'। আমরা একসময় চেয়েছিলাম রাষ্ট্রভাষা বাংলা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা পেয়ে গেলাম বাংলা ভাষার রাষ্ট্র। বাংলা ভাষার এখানেই বড় বিজয়, এখানেই বাংলা ভাষার চরম সফলতা।

লেখক: সাবেক উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

একুশের চেতনা ও বাংলা ভাষার বর্তমান বাস্তবতা

আহমদ রফিক

একুশের চেতনা ও বাংলা ভাষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলার আগে ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনে, এমনকি রাষ্ট্রীয় জীবনে ভাষা তথা মাতৃভাষার ভূমিকা নিয়ে দু-চার কথা বলা দরকার। কারণ একটি ভাষিক জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও আত্মবিকাশ শুধু ভূখণ্ড ভিত্তিতে নয়, তার রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে ঘটে থাকে এবং সেক্ষেত্রে ভাষা একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভিত্তি। তাছাড়া ভাষার রয়েছে সর্বজনীন ও শ্রেণি-নির্বিশেষ চরিত্র, যা নির্দিষ্ট ভাষিক জনগোষ্ঠীকে একসূত্রে বেঁধে রাখে।

আধুনিকতার পীঠস্থান হিসেবে বিবেচিত ইংরেজি, ফারসি, জার্মান প্রভৃতি ভাষার দেশগুলোতে মাতৃভাষা ও ভাষিক জাতীয়তার চেতনাধৃত আবেগ কম নয়। এমন এক বাস্তবতার তাত্ত্বিক প্রকাশ দেখা যায় নৃতত্ত্ববিদ, ভাষাবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদ অনেকের লেখায়। একই কথা বিলেতি বিশ্বকোষের। এমন মন্তব্যে যে, মাতৃভাষা তার আপন শক্তিতে জাতিরাষ্ট্র ও ভাষিক জনগোষ্ঠীর সদস্যদের অন্তর্নিহিত সংহতি রক্ষা করে থাকে। ভাষার অভাব যেমন মানুষকে প্রায় অস্তিত্বহীন করে তোলে, নির্দিষ্ট ভাষিক জনগোষ্ঠীর জন্য তার মাতৃভাষার অবস্থানও প্রায় একই পর্যায়ের। তাই মাতৃভাষা ব্যক্তিজীবনে, জাতীয় জীবনে প্রথম ভাষা হিসেবে স্বীকৃত, সে হিসেবেই এর গুরুত্ব। পরিণত বয়সে শেখা ভাষাগুলো তাই দ্বিতীয় তৃতীয় ভাষা হিসেবে বিবেচিত। ভাষা ও জাতিসত্তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বিষয়টি এতই গভীর যে সেখানে অস্থানিক ধর্মীয় ভাষাও স্থায়িত্ব পায় না। মধ্যযুগের ইউরোপে ধর্মীয় ভাষা লাতিনের আধিপত্য হার মেনেছিল সেখানকার স্থানিক ভাষা জাতীয় ভাষাগুলোর কাছে। জন্ম নেয় কয়েকটি ভাষিক জাতিরাষ্ট্র। রবীন্দ্রনাথ এ পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছেন তাঁর লেখায়।

মাতৃভাষা সেই ভাষিক জাতিগোষ্ঠীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ধারক বাহক। রাজনীতি রাষ্ট্রনীতি ব্যতিক্রম নয়। মাতৃভাষার বিকাশ এবং উন্নতি সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে, চলে পরস্পর নির্ভরতায়। মাতৃভাষার শক্তিসামর্থ্য ও আর্থসামাজিক ভূমিকা ভাষিক জনগোষ্ঠীর (শিক্ষিত শ্রেণির) সচেতন তৎপরতার ওপর নির্ভর করে। অনেক সময় নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জাতীয় পরিচয় তার ভাষিক পরিচয়ে, যা জাতিসত্তা ও ভাষিক সত্তার আত্মিক সম্পর্ক চিহ্নিত করে থাকে। তাই অনেক সময় ভূখণ্ডের পরিবর্তন ঘটলেও ভাষিক জাতীয়তার পরিচয় পাল্টায় না। যেমন শ্রীলঙ্কার তামিলভাষী জনগোষ্ঠী বা জাতি। উল্লেখ করা যেতে পারে ইহুদিদের প্রবল জাতীয় চেতনার কথা। কিংবা ইরাকে, ইরানে, তুরস্কে বসবাসরত কুর্দিদের জাতিচেতনার বিষয়। উদাহরণ কম নেই। এ উপলক্ষে স্মরণযোগ্য তথ্য: ভাষা হতে পারে ভাষিক জনগোষ্ঠীর মুক্তিসংগ্রামের প্রেরণা।

মাতৃভাষার উল্লিখিত গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ভাষা আন্দোলন বিষয়ক আলোচনা, যে-আন্দোলন সংঘটিত হয় ভারত-বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গে (পরবর্তী নাম পূর্ব পাকিস্তান)। মুসলিম লীগ নেতাদের উর্দু রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক বিবৃতির কারণে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে লিখিত তাত্ত্বিক প্রতিবাদ অবশ্য জুন-জুলাইয়ে (১৯৪৭) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে, প্রধানত লেখক-সাংবাদিক আবদুল হক, মাহবুব জামাল জাহেদী প্রমুখের রচনায় ইত্তেহাদে, আজাদে। মিলাত লেখে বাংলার পক্ষে সম্পাদকীয় কলাম।

একে কেউ কেউ ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব নামে উল্লেখ করে থাকে। এর ধারাবাহিকতা চলেছে ১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বর থেকে একাধিক লেখক ও

সংগঠনের তৎপরতায়। যেমন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, আবুল মনসুর আহমদ, অধ্যাপক আবুল কাসেম প্রমুখের রচনায় বা বিবৃতিতে। এ সময়ের সাংগঠনিক তৎপরতায় তমদ্দুন মজলিস, যুবলীগ, গণআজাদী লীগ, ছাত্রলীগ, ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নাম।

ভাষা আন্দোলনের সংগঠিত, সংহত রূপ প্রকাশ পায় ১৯৪৮-এর ১১ মার্চের তৎপরতায় এবং এর পরিণত বিস্ফোরক প্রকাশ ঘটে ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারির ব্যাপক আন্দোলনে, যা একুশের আন্দোলন নামে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। মধ্যবর্তী সময়ে মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের মতো একাধিক ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ একুশের বিস্ফোরক পরিস্থিতি তৈরির সহায়ক হয়েছে।

এসব ঘটনার নেপথ্য কারণ পাকিস্তানি শাসকশ্রেণির উর্দু চাপানোর জবরদস্তি। যেমন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে তেমনি পূর্ববাংলায় উর্দুশিক্ষার বিস্তারে, সর্বোপরি আরবি হরফে বাংলা লেখার সরকারি অপচেষ্টায়, যা হরফ চক্রান্ত নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। প্রতিক্রিয়ায় ও প্রতিবাদে মিছিলে মিছিলে উচ্চারিত স্লোগান : আরবি হরফে বাংলা লেখা চলবে না, উর্দুর জুলুম চলবে না ইত্যাদি। বিশদ বিবরণের পরিবর্তে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, মূলত উর্দুভাষী ও একদা রাজভাষা ইংরেজি পাকিস্তানের শীর্ষ শাসকশ্রেণি বাংলা ভাষা ও বাঙালির প্রতি অবজ্ঞা, বৈষম্য, বিরূপতা ও বিরোধিতার যে প্রকাশ ঘটায় তার উদাহরণ ছড়িয়ে আছে তাদের তৎকালীন বক্তৃতায়-বিবৃতিতে, বিতর্কে ও আলোচনায় এবং গণপরিষদের কার্যবিবরণীতে, সর্বোপরি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টিতে, যা সামাজিক ক্ষেত্রেও বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করেছে। এদের সঙ্গে তাল মিলিয়েছেন মুসলিম লীগের বাঙালি নেতৃবৃন্দ যেমন ব্যক্তিস্বার্থ ও শ্রেণিস্বার্থের টানে, তেমনি অদ্ভুত এক হীনমন্যতার প্রভাবে। এর সদ্ব্যবহার ভালোভাবেই করেছিল কেন্দ্রীয় পাকিস্তানি শাসকবর্গ।

পূর্বোক্ত হীনমন্যতা ও উগ্র ধর্মীয় চেতনার প্রভাবে শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের একটি বড়সড় অংশ ধর্মকে জাতিজ্ঞান করেছে এবং ভাষা ও ভাষিক সংস্কৃতিকে ধর্মীয় চেতনার অনুগত বা আজ্ঞাধীন বিবেচনা করেছে। যেমন উনিশ শতকের শেষদিকে তেমনি বিশ শতকের প্রথম দিকে এ জাতীয় চেতনার বিশেষ প্রকাশ। তাই মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ বাঙালির জাতীয়তা ও ভাষা সম্পর্কে বলতে পেরেছেন যে 'মুসলমানের জাতীয়তা ধর্মগত, মুসলমানের জাতীয় ভাষা আরবি।' অবশ্য এর বিপরীত বিশ্বাসও

একশ্রেণির বাঙালি মুসলমানের ছিল, যারা বাঙালির বাংলা ভাষিক জাতীয়তায় বিশ্বাসী। তবে প্রথম পক্ষ ছিল অধিক শক্তিমান।

এমন এক দ্বিভাজিত চেতনা নিয়ে বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের পাকিস্তান নামক স্বতন্ত্র নব্য ভুবনে প্রবেশ এবং তা অনেক প্রত্যাশা নিয়ে। সে প্রত্যাশা শ্রেণি-নির্বিশেষে সবার। ভিন্নমতাবলম্বীগণ সংখ্যায় এত কম যে তা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু অবাঙালি শাসকদের বাঙালি বিরোধিতা সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে এত প্রকট হয়ে ওঠে যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ভাষা আন্দোলন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে সূচীত ভাষা আন্দোলন কয়েকজন ছাত্র-অছাত্রের শাহাদাত বরণের মধ্যে দিয়ে জাতীয় আন্দোলনের মর্যাদা অর্জন করে। প্রদেশব্যাপী সর্বত্র ছড়িয়ে যায় সে আন্দোলন। এমনকি অখ্যাত প্রান্তিক গ্রামের স্কুল পর্যন্ত তার বিস্তার। একুশে ফেব্রুয়ারি হয়ে ওঠে শহিদ দিবস। শহিদ স্মৃতি অমর করে রাখতে তৈরি হয় শহিদ মিনার প্রতিবাদী চেতনার প্রতীক হিসেবে। এ আন্দোলনের প্রভাব পড়ে সাহিত্য-সংস্কৃতিসহ জাতীয় জীবনের নানা স্তরে। সে প্রভাব সংশ্লিষ্ট খাতে গুণগত পরিবর্তন ঘটায়। সে পরিবর্তন গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িকতা ও প্রগতিচেতনার মিশ্ররূপ নিয়ে পরিস্ফুট। সঙ্গে যুক্ত হয় পরিশীলিত লোকসংস্কৃতির প্রকাশ। এর পরিচয় মেলে একুশে-উত্তর সাহিত্য সৃষ্টিতে সংস্কৃতিচর্চায় যা পরিস্ফুট ১৯৫২ (কুমিল্লা), ১৯৫৪ (ঢাকা), ১৯৫৭-র (কাগমারী) সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলনে। রাজনীতিতে এর প্রকাশ একুশ দফার বহুমাত্রিক ইশতেহারে এবং যুক্তফ্রন্টের বিজয় ও সম্প্রদায়বাদী স্বৈরাচারের পতনে।

বায়ান্নর ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের আদর্শিক মর্মবস্তু একুশের চেতনা নামে পরিচিতি লাভ করেছে। মিছিলে মিছিলে উচ্চারিত মূলত তিনটি স্লোগানে তা পরিস্ফুট। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই দাবিতে শুধু আক্ষরিক অর্থে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতিই নয়, জাতিসত্তার আর্থসামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তার দাবিও প্রতিফলিত। রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে সেক্যুলার গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক অধিকারের মতো বিষয়াদিও অন্তর্ভুক্ত। আর সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের দাবি প্রকৃতপক্ষে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে, অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা থেকে উচ্চ আদালতের মতো সর্বত্র মাতৃভাষা বাংলা ব্যবহারের দাবি নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, যা ভাষিক জাতিরাষ্ট্রের পক্ষে আবশ্যিক শর্ত। এভাবেই একুশের চেতনা তার আদর্শিক উচ্চারণে সেক্যুলার বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরে। আমার বিশ্বাস চতুর পাকিস্তানি শীর্ষ

আমলাতন্ত্র ও রাজনীতিকদের তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। এর উত্তরপ্রভাব তারা লক্ষ্য করেছে ষাটের দশকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির দ্রুত বিকাশে, ছয় দফা ও এগারো দফার দাবিতে যা পরিস্ফুট। তাই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তাদের চোখে বিচ্ছিন্নতার দাবি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। শেষ দিকে সে আশঙ্কার প্রকাশ্য উচ্চারণে তাদের দ্বিধা ছিল না, বিশেষ করে ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের একচেটিয়া বিজয়ের পর। আশঙ্কা ও আতঙ্কে তারা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলোকে ধ্বংস করেছে। সুষ্ঠু নির্বাচনের জনরায়কে প্রত্যাখ্যান করেছে। ক্ষমতা ধরে রাখতে চূড়ান্ত করেছে সামরিক অভিযান, গণহত্যা ইত্যাদি।

একুশের চেতনাধৃত আন্দোলনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উপস্থিতি ও জাতিরাষ্ট্রের সম্ভাবনা নিয়ে ভিন্নমতের তাত্ত্বিক বিতর্ক রয়েছে, যদিও তা ব্যাপক নয়। অনুপুঙ্খ বিচারে অস্বীকার করা চলে না যে একুশের আন্দোলন, একুশের চেতনা প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্নভাবে পাকিস্তানি দ্বিজাতিতত্ত্বের আদর্শ ও তাতে নিহিত সম্প্রদায়বাদী চেতনা অস্বীকার করে সেক্যুলার বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজতলা তৈরি করেছিল, যেখান থেকে সেক্যুলার বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের অঙ্কুর গজিয়েছে, যেখানে অর্থনৈতিক স্বাধিকারের বীজটিও প্রোথিত।

অবশ্য স্বীকার্য যে, যেমন একুশের তেমনি ছয় দফার দাবিতে স্বাধীন বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের প্রকাশ্য উচ্চারণ ছিলো না, উগ্র পাকিস্তানি দমননীতির মুখে তা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু ওই চেতনার মর্মবস্তু সেখানে উপস্থিত ছিলো, যা অনুকূল পরিবেশে পরিস্ফুট হতে থাকে। রাজনৈতিক অনাচারে তা দেখা দিয়েছিলো, একাত্তর তার প্রমাণ। এর আগে মাঝেমধ্যে সেই প্রত্যয়ের হঠাৎ ঝিলিক দেখা গেছে কিছু ছোটখাটো ঘটনায়। যেমন ১৯৪৮-এর ডিসেম্বরে ঢাকার সাহিত্য সম্মেলনে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ চমক লাগানো উক্তি, 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।' অন্যদিকে স্মর্তব্য একুশ দফার ১৯ সংখ্যক দফায় পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমত্ব দাবি (ডিসেম্বর, ১৯৫৩) এবং ১৯৫৭-র ফেব্রুয়ারি কাগমারী সম্মেলন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে আঙুল তুলে মওলানা ভাসানীর বহু আলোচিত বিচ্ছিন্নতাবাদী উক্তি, 'আসসালামু আলাইকুম।'

কিন্তু এসব তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ফুলকি আত্মবিশ্বাসী পাকিস্তানের সামরিক-অসামরিক শাসকদের চেতনায় দাগ কাটেনি। তাদের সামরিক শক্তিনির্ভর আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরায়নি। এ বিষয়ে রাজনৈতিক বিচক্ষণতা তাদের সাহায্য

করেনি। সমরশক্তির গর্বে স্ফীত শাসকগণ রাজনীতিকে সরাজ্ঞান করেছে। পরিণামে অনেক রক্তের ঋণ মেটাতে পাকিস্তানের অঙ্গচ্ছেদ, পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা, স্বাধীন ভাষিক জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

প্রয়াত অধ্যাপক মমতাজুর রহমান তরফদার একুশে, জাতিসত্তা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লিখেছেন, 'ভাষা আন্দোলন একটি জাতিসত্তাকে সংহত করে পরোক্ষভাবে হলেও একটি জাতিরাষ্ট্রের ভিত গড়ে তুলেছে। মধ্যশ্রেণি আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামে নেমেছিল অবশ্য সর্বসাধারণের জন্য। এ আন্দোলনটির সঙ্গে তুলনায় অন্য কোনো আন্দোলন বাংলার ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর' (অমর একুশে বক্তৃতা, ১৯৯৩)। আমার বক্তব্য, এক্ষেত্রে প্রধান শক্তি মধ্যশ্রেণি নয়, তাদের তরুণ প্রজন্ম। এছাড়া একুশের ব্যাপক উত্তরপ্রভাব বিবেচনা করতে গেলে মূল উক্তি সঠিক মনে হয়। শহিদ দিবসের অসাধারণত্ব বিচার করেই বোধ হয় ইউনেস্কো কর্তৃক 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ২১ ফেব্রুয়ারির স্বীকৃতি (১৯৯৯)। এটা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়।

কিন্তু একুশেচেতনার বড় ট্র্যাজেডি হচ্ছে তার বাস্তবায়ন নিয়ে। স্বাধীন বাংলাদেশের সমাজে একুশে চেতনাধৃত গণতান্ত্রিক, সেক্যুলার মূল্যবোধ কতটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে ধারায় সমাজে কতটা গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে তা নিয়ে অনেকের অনেক যুক্তিসংগত প্রশ্ন উঠে এসেছে। প্রথমত সংবিধানে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা, এমন ঘোষণা সত্ত্বেও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে, বিশেষত উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, উচ্চ আদালতে বাংলার বদলে ঔপনিবেশিক রাজভাষার সুদৃঢ় অবস্থান। তাতে জনস্বার্থ, নিম্নবর্গীয় স্বার্থ ব্যাহত হচ্ছে। আরো হচ্ছে বিপুলসংখ্যক ইংরেজি মাধ্যমের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষায়তনের কারণে। শিক্ষার্থী সমাজ ইংরেজি ও বাংলা মাধ্যমে দ্বিভাজিত। নতুন উপদ্রব ইংলিশ ভার্সন ব্যবস্থা। মাতৃভাষা ক্রমে পিছু হটছে। তাছাড়া রয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষার ভিন্নধারা।

ইংরেজির পক্ষে আন্তর্জাতিকতার অজুহাত যে ধোপে টেকে না তার প্রমাণ চীন, জাপানের মতো একাধিক রাষ্ট্রে প্রাগৈতিহাসিক বর্ণমালা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষায় মাতৃভাষার ব্যাপক ব্যবহার। একই ঘটনা বিজ্ঞান শিক্ষা ও উচ্চপ্রযুক্তির গবেষণা ক্ষেত্রে। চীনা ভাষায়, জাপানি ভাষায় যদি মহাকাশ গবেষণা, আণবিক গবেষণা চলতে পারে তাহলে উন্নত বাংলা ভাষায় তা চলবে না কেন? এক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান শ্রমসাধ্য হলেও অসম্ভব নয়। আসলে সমস্যা অন্যত্র। মাতৃভাষা নিয়ে আমাদের হীনমন্যতার কারণে আমরা মাতৃভাষাকে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে, জীবিকার সঙ্গে যুক্ত করিনি। পুরনো

অভ্যাসমাফিক পুরনো রাজভাষার অভ্যস্ত বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার শ্রম স্বীকার করতে চাইনি। ভাবিনি যে, আন্দোলনে-লড়াইয়ে যে তাৎক্ষণিক অর্জন ঘটে তার ব্যবহারিক বাস্তবায়ন না ঘটালে সে অর্জন স্থায়ী হয় না। একুশের চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আদর্শিক সূত্রগুলোর বাস্তবায়নে আমরা অবহেলা করেছি। সে কারণে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মাতৃভাষা বাংলা পিছিয়ে পড়েছে, এখনো পড়ছে। অথচ আমরা জানি, বিশ্বের অধিকাংশ জাতিরাষ্ট্রে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে তাদের মাতৃভাষার সার্বিক ব্যবহার চলে আসছে, যা তাদের জাতীয় উন্নতির স্বচ্ছন্দ পথ তৈরি করছে।

মাতৃভাষা বাংলার প্রতি আমাদের অনাদর-অবহেলার আরো প্রমাণ সেই ভাষার মানসম্মত চর্চার অভাব। বক্তৃতায়, ভাষণে, টিভির টকশোর আলোচনায় পর্যন্ত ইংরেজি-বাংলার উদ্ভট মিশ্রভাষা বুঝিয়ে দেয় মাতৃভাষা বাংলাকে আমরা কী চোখে দেখি। বিজ্ঞাপনে, সাইনবোর্ডে বানান বিকৃতি আর উচ্চারণ দুষ্ট কথকতায় একই সত্য উঠে আসে।

প্রাত্যহিক জীবনাচরণে বাংলা তার মননশীল চর্চায় যেন এক দুঃসময়ের পথ পাড়ি দিচ্ছে। এফএম রেডিও'র বিনোদন অনুষ্ঠানে উদ্ভট ভাষার অনাচার সে যাত্রায় নতুন মাত্রা যোগ করছে। বিষয়টি এত আলোচিত যে উদাহরণ টানার প্রয়োজন পড়ে না। দুর্ভাগ্যজনক যে তরুণ প্রজন্ম এসবে আকর্ষিত হচ্ছে। আর ঘরে ঘরে হিন্দি ছবি বা সিরিয়ালের প্রভাব ছোটদের ওপরও পড়ছে। বাংলার স্থান মনে হয় একদিন দখল করে নেবে ইংরেজি ও হিন্দি তাদের শক্তিমান আগ্রাসনে। বাংলা টিকে থাকবে শুধু সাহিত্যে ও সংস্কৃতিচর্চায় এবং মুখের বুলিতে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য একুশের চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিস্ফুট বাস্তবায়নে অগ্রসর হওয়া, মাতৃভাষাকে সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে হাত লাগানো, তা সে কাজ যত শ্রমসাধ্যই হোক। আর দরকার সে কাজে তরুণ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা। সঙ্গে একটি অপ্রিয় কথা, উপনিবেশবাদের অভিশাপ হিসেবে ইংরেজি আমাদের জাতীয় জীবনে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে একাধিক কারণে তাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শিখতে হবে, তবে মাতৃভাষার বিকল্প হিসেবে নয়। বড় কথা, দুটো ভাষাই ভালোভাবে শিখতে হবে এবং তা গোঁজামিলের শেখা নয় যে শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না। আসলে সব শিক্ষাই যে উচ্চমানের হতে হবে সে বিষয়ে ভিন্নমতের কোনো অবকাশ নেই হোক তা মাতৃভাষা বা বিদেশি ভাষা।

লেখক : ভাষা সংগ্রামী, গবেষক ।

সত্যিই বিস্ময়কর

মো. লুৎফর রহমান

পৃথিবীর প্রতিটি জাতি তার মাতৃভাষাকে ভালোবাসেন। বাঙালি জাতি বাংলা ভাষাকে ভালোবাসে প্রাণের চেয়েও বেশি। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি বুকের রক্তে রঞ্জিত হ'ল প্রিয় বর্ণমালা অ-আ-ক-খ । ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মে আসামের শিলচরে ওঁরা এগারোজন প্রাণ দিলো বাংলা ভাষার দাবিতে । মাতৃভাষার মান রক্ষায় মায়ের কোলে সন্তানের লাশ । বাঙালি জাতি প্রমাণ করেছে মায়ের ভাষা প্রাণের চেয়েও প্রিয় । এমন আবেগ বিশ্ববাসীর নিকট সত্যিই বিস্ময়কর।

২১ ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এ দিবসের তাৎপর্য এখন ব্যাপক ও বিস্তৃত। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায়-উপজেলায় এমনকি গ্রাম পর্যায়েও বিভিন্ন স্থানে নির্মিত হয়েছে শহিদ মিনার। ২১ ফেব্রুয়ারির প্রভাত ফেরিতে মানুষের পদযাত্রা ভাষার প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা। কবিতা-গানে-পুষ্প অর্পণে বাঙালি ভাষার প্রতি যে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তা সত্যিই বিস্ময়কর ।

শহিদ মিনারে প্রগাঢ় ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে, পুষ্প অর্পণ করে। নগ্নপায়ে, যে মানুষটি তার আপন আলয়ে ফেরেন পরম প্রশান্তিতে। সেই বাসভবনের নাম যদি হয় 'প্যারাডাইস হাউজ' 'গোল্ডেন কটেজ' 'জিনিয়ার পার্ল, 'ইস্টার্ন ভ্যালি', 'ইস্টার্ন ফরচন', 'কনকর্ড প্যানারোমা', 'ইস্টার্ন পয়েন্ট', 'টোটাল কামেলিয়া' কী অপূর্ব। কারুকার্যমণ্ডিত মৌলিক বাসভবন। সত্যিই নয়নাভিরাম, কোনো বিদেশি থাকেন না এসব বাসভবনে । এখানে থাকেন ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলের মানুষ যাঁরা প্রভাত ফেরিতে নগ্নপায়ে, বলেন 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কী তুলিতে পারি!'

শহিদ মিনার থেকে বাড়ি ফিরতে ফিরতে যদি বাংলা ভাষার শব্দ ভুলে গিয়ে বিদেশি ভাষার চর্চা শুরু হয়; তাহলে বাংলাভাষা প্রাণ পাবে কোথা থেকে।

শুধু প্রত্যুষে শহিদ মিনারের পাদদেশে বাংলা চর্চা সে আবার বছরে মাত্র একটি দিন । ঐ দিনটি শেষ হলেই চলতে থাকে বিদেশি ভাষার চর্চা । বিদেশি ভাষার বানান ও উচ্চারণে বাঙালি ভুল করে না। বিস্ময়কর হলেও সত্য বাঙালির ভুল হয় বাংলা বানানে, বাংলা উচ্চারণে।

বাংলা বানান ভুল হবার আশঙ্কায় বাড়ির নাম বাংলায় লেখেন না। ধানমণ্ডি এলাকায় প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁর বাসভবনের নাম ছিল 'দখিন হাওয়া'। কী অপূর্ব! এখনো অভিজাত এলাকায় বাস ভবন বিদেশি ভাষায় নামকরণের পাশে বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে বাড়ির নামকরণ করেন 'স্বপ্নবিলাস', 'ছায়ানীড়', 'ভোরের দোয়েল', 'স্বপ্নবিলাস', 'শীতল ছায়া', 'ছায়ানিবাস', 'শান্তিনিকেতন', 'শাল্মলী', 'ক্ষণিকালয়', 'তপতি নিবাস', 'সূর্যদীঘল বাড়ি'।

সম্প্রতি শহরের অধিকাংশ নিমন্ত্রণপত্র লেখা হয় ইংরেজিতে। সেনাকুঞ্জে কিংবা সেনা মালঞ্চে অনুষ্ঠিত বিয়ে অথবা বৌভাতের নিমন্ত্রণপত্রের ভাষা ইংরেজি । ভাবলাম বিদেশিরা থাকবেন এজন্য হয়তো ইংরেজি ভাষায় পত্রটি ছাপা হয়েছে। বিস্ময়কর ব্যাপার ঐ অনুষ্ঠানে কোনো ইংরেজ বা বিদেশির উপস্থিতি নেই। কী অবাক কাণ্ড! অনুষ্ঠানে কোনো বিদেশি নেই অথচ বিদেশি ভাষায় পত্র লিখে আমরা গৌরব বোধ করি। সত্যিই বাঙালির ভাষা প্রেম বিস্ময়কর ।

মোবাইল ফোনে বার্তা পাঠানো অনেক সহজতর উপায়, তাই পত্রলেখা অনেকে ভুলেই যাচ্ছেন। পত্রসাহিত্য বাংলা ভাষার ভাণ্ডারকে অনেকে সমৃদ্ধ করেছে । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুলসহ অনেক জনপ্রিয় সাহিত্যিকের

পত্রালাপ এখনো পাঠককে ঋদ্ধ করে। সম্প্রতি মোবাইলে বার্তা পাঠানোর প্রক্রিয়া সত্যিই বিস্ময়কর। জনৈক ব্যক্তি তার প্রেয়সীকে লিখলেন- ' Ami Tomake Khub Valobashi'

পৃথিবীর বহু ভাষার নিজস্ব বর্ণ নেই। অন্য ভাষার বর্ণ ব্যবহার করে তারা নিজস্ব ভাষা প্রকাশের চেষ্টা করে। আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারতের ত্রিপুরায় যারা রককবরক ভাষায় কথা বলেন তাদের ভাষার নিজস্ব কোনো বর্ণ নেই। ইংরেজি বর্ণে বা বাংলা বর্ণে তারা ককবরক ভাষা লিখে থাকেন।

কী অবাক কাণ্ড ! বাংলা ভাষা বিশ্বের মধুরতম ভাষা । বাংলা ভাষা অতন্ত বিজ্ঞান সম্মত। বাংলা ভাষায় প্রয়োজনীয় বর্ণ রয়েছে যা ভাষাকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারে। আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি; বাক্যটি বাংলা বর্ণে প্রকাশ করলে ভাষার প্রতি ভালোবাসা যথাযথ প্রকাশ পায়। এমন বাক্য শুনে প্রেয়সীরও হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

শুভ সকাল, শুভ মধ্যাহ্ন, শুভ সন্ধ্যা, শুভ রাত্রী এমন সম্ভাষণ আমাদের প্রয়োজন। গুড মর্নিং, গুড আফটার নুন, গুড ইভিনিং 'গুড নাইট' এসব পরিহার করি। এক বাঙালি আরেক বাঙালিকে 'ওয়েলকাম' না জানিয়ে 'স্বাগত' জানাই 'সুস্বাগত' এমন ভুল বলার প্রয়োজন নাই। চরিদিকে যখন-

'জয় বাংলা জয় বাংলা বাংলা মধুর ধ্বনি শোনা যায়
বিশ্ববাসী অবাক বাংলা ভাষার চেতনায়'।

লেখক: বাংলা ভাষার ফেরিওয়ালা ও অধ্যাপক, বঙ্গবন্ধু মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।